রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য

অর্থাৎ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক রামচন্দ্রের

জীবনকাহিনী।

———·———

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী হইতে

সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

এস, সি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

উনবিংশ শতাব্দীর ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবকালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়বার্ত্তা ভারতবর্ষের, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মপিপাসুগণ সকলেই অবগত আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সরল ভাষায় মধুর উপদেশে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে, এই উপদেশাবলী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়বাণী তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সেবক মহাত্মা রামচন্দ্র ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রথমে অবগত করাইয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ এবং বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন। সেবক রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকেই ধ্রুবতারাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আপন জীবন তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করায়, তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া এই পুস্তক প্রকাশে অভিলাষী হইয়াছি। তত্ত্বমঞ্জরী নামক মাসিক পত্রিকায় সন ১৩০৫ সালের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যায় মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও উচ্ছ্বাস, সন ১৩০৯ সালের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম সংখ্যায় মহাত্মার ত্যাগস্বীকার, বিশ্বাস ও ভক্তি, দীনভাব; সন ১৩১০ সালের তৃতীয় ও দশম সংখ্যায় মহাত্মার দয়া ও ঐশ্বরিক শক্তি এবং সন ১৩১১ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় মহাত্মার সন্ন্যাসভাব নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি একত্রিত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

এই পুস্তকে যে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইল, পাছে তাহাতে কোন ভ্রম থাকে, সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সেবক বীরভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করান হইয়াছিল। তিনি যেরূপ স্থানে স্থানে সংশোধন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। তৎপরে তিনিও মহাত্মা সম্বন্ধে "রামদাদা" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহা তত্ত্ব-মঞ্জরীর ১৩১১ সালের নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া কোনও পাঠকের কোনওরূপ উপকার হইলে বিশেষ আনন্দিত ও কৃতার্থ হইব।

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী,
কলিকাতা।
৩০এ শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল।

শ্রীরামকৃষ্ণকৃপাপ্রার্থী
যোগবিনোদ।

সূচী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য

মহাত্মা রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত।

মহৎ ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার গুণগ্রামের বিষয় চিন্তা করিলে আমাদিগেরও জীবনে কথঞ্চিৎ পবিত্রতার সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা; এই জন্যই পুণ্যশ্লোক নরনারীগণের চরিত্রালোচনা করিবার প্রথা চিরদিন প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রামচন্দ্র ১৭৭৩ শকাব্দ ১৪ই কার্ত্তিক বুধবার শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। পিতামহের নাম ৺কুঞ্জবিহারী দত্ত। ইঁহাদিগের নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নারিকেলডাঙ্গায় ছিল। কুঞ্জবিহারী একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ও সংস্কৃত ভাষায় বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অনেক মন্ত্র-শিষ্য ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই প্রায় সন্ন্যাসী। কুঞ্জবিহারী একজন সেকালের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। রামচন্দ্রের পিতা নৃসিংহপ্রসাদও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। রামচন্দ্রের মাতার নাম তুলসীমণি। তিনি অতিশয় দয়াবতী রমণী ছিলেন।

রামচন্দ্র আপনার মাতার দয়ার বিষয় সর্ব্বদাই সকলের নিকট গল্প করিতেন। শুনিয়াছি, যখন তিনি গৃহকর্ম্মের পরিসমাপ্তির পর আহারে বসিতেন, সে সময়ে প্রায়ই কোন নীচবংশীয়া দরিদ্রা প্রতিবাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইত। রামচন্দ্রের মাতা তাহাকে আপনার স্ত্রী-সুলভ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেন, "হ্যাঁ বাছা! তোমার খাওয়া হয়েছে?" সে প্রায় অনেক সময়েই আপনার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া কহিত, "না।" রামচন্দ্রের মাতা [illegible] সে

সময়ে আহারের জন্য উপবেশন করিতে যাইতেছেন, অথবা দুই চারি গ্রাস ভোজন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। তিনি ভোজ্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। ননদিনী প্রভৃতি গুরুজনেরা আহার না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "শরীর কেমন অসুখ অসুখ করিতেছে।" বলা বাহুল্য, দরিদ্রা মনের সাধে আহার করিতে বসিত। এই রূপে অনেক সময়েই রামচন্দ্রের মাতা অভুক্ত অথবা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিতেন। রামচন্দ্র মাতার এই করুণামাখা স্বভাব পূর্ণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন বলিয়াই এ ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

যখন রামচন্দ্রের বয়স আড়াই বৎসর, তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। আত্মীয়েরাই মাতৃহীন শিশুকে লালনপালন করিয়াছিল। বাল্যকালে রাম নারিকেলডাঙ্গার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন।

বালকের বাল্য-স্বভাব অনেক সময়ে ভবিষ্যৎ চরিত্রের আভাস প্রদান করিয়া থাকে। রামের সম্বন্ধে তাহা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। দেবসেবা তাঁহার ক্রীড়ার প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি কখন আপনার খেলাঘরের ঠাকুরের ভোগরাগ দিতেন; কখন সখী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য করিতেন; কখন মহোৎসব করিতেন এবং সমবয়স্কদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ খাওয়াইতেন। নারিকেলডাঙ্গায় শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রম ও শিখের বাগান নামে একটী স্থান ছিল। দুইটীতেই সাধু সন্ন্যাসীরা থাকিতেন। রাম সর্ব্বদাই এই দুই স্থানে গমনাগমন করিতেন। সাধুরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত এবং যাইলে প্রসাদ দিত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে দেবতায় ভক্তি ও দেবসেবানুরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কুঞ্জবিহারী দত্তের মৃত্যুর পর, রামের পিতা নৃসিংহপ্রসাদ নানাপ্রকারে সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। এমন কি, পৈতৃক বসতবাটীখানিও বিক্রয় করিয়াছিলেন। যে স্থানে এক্ষণে হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী, ঠিক ঐ স্থানেই রামচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল।

যে তেজস্বিতা ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণ পরিমাণে বিকশিত হইয়া তাঁহার নিকট অনেকের মস্তক নত করিয়াছিল, যাহার বলে শত শত লোক বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইলেও তিনি আপনার বিশ্বাসানুযায়ী পরিচালিত হইতে সমর্থ হইতেন, তাহার পরিচয় বাল্যকালেই রামচন্দ্রের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স প্রায় দশ বৎসর, তখন তিনি একবার হরিপালে কোন কুটুম্বের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণববংশে জন্ম, সুতরাং রামচন্দ্র কস্মিন্‌কালে মাংস ভোজন করেন নাই। মাংস জিহ্বায় স্পর্শ করা এক মহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। যে কুটুম্বের গৃহে যাইয়াছিলেন, সে কিন্তু অতিশয় মাংসপ্রিয়। সে ছাগ মাংস আনিয়া রামচন্দ্রকে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। রামচন্দ্র কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। পরিশেষে সে রামের প্রতিবাদ না শুনিয়া জোর করিয়া তাঁহার ভোজন-পাত্রে উহা প্রদান করিতে যাইল। সুপ্ত কালসর্পের মস্তকে পদনিক্ষেপ করিলে যেমন সে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে, রামও সেই ব্যবহার দেখিয়া আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচার সংঘটিত হইবে ভাবিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়াই, বাটী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কুটুম্বের পত্নী তাঁহাকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। আপনার মনে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। দশ বৎসরের বালক, কোন্ পথে কলিকাতায় যাইতে হয় তাহা কিছুই জানিতেন না। তাঁহার নিকট বেশী অর্থও ছিল না যে, গাড়ী করিয়া আসিবেন; সুতরাং পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোন্নগরাভিমুখী হইলেন। মধ্যাহ্নে কুটুম্বের বাটী ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন্নগর আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইল। ক্রমে রাত্রি আসিল। রাম তখন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় কিন্তু বিস্ময়জনক নির্ভীকতায় গঠিত। এক গৃহস্থের দ্বারের নিকট বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিনের অনাহার ও পথ-পর্য্যটন-ক্লেশ বালকের কোমল শরীরে অতিরিক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

উক্ত গৃহস্থের বধূ কোন গৃহ-কর্ম্মের জন্য বহির্ব্বাটীতে আসিলে দেখিতে পাইলেন, একটী সুন্দরাকৃতি অপরিচিত বালক দ্বারের নিকট বসিয়া রহিয়াছে। রামের অনাহার ও পরিশ্রান্তি-ক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখখানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি রামের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর, আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে?" রাম আপনার সমস্ত দিনের অনাহারের কথা জানাইলেন। গৃহস্থের বধূ তাঁহাকে বাটীর

ভিতরে লইয়া যাইয়া অন্ন, কড়াইএর দাল ও সামান্য ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে দিলেন। রাম তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন এবং আপনার সৌভাগ্যের অবস্থায়ও প্রায়ই গল্প করিয়া কহিতেন, "তেমন কড়াইয়ের দাল, আর ভাত, আমি আর কখন খাইলাম না।"

রামের আহার হইয়া যাইলে পর গৃহস্থেরা তাঁহার শয়ন করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের আপনাদের বাটীতে স্থান না থাকায় তাহারা রামকে নিকটস্থ এক বড়লোকের বৈঠকখানায় লইয়া যাইল। বাবুরা বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধব লইয়া বসিয়াছিলেন। বালকের নির্ভীকতার বিষয় শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথাপি কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ-চ্ছলে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। রাম সকলের কথাই নীরবে শ্রবণ করিলেন। পরে বাবুদের অনুমতি অনুসারে সেই বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীরা হইতে লাগিল। বাবুদের বন্ধু-বান্ধবেরা এক একটী করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় আবার আর এক দল বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাবুরা সকলে মিলিয়া "গুলি" নামক মাদক দ্রব্য সেবনে নিযুক্ত হইলেন। যখন নেশার মাত্রা একটু ঊর্দ্ধে উঠিল, তখন তাঁহারা রামকে প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কেহবা মাদক দ্রব্যের প্রসাদের পরিবর্ত্তে নকুলের (চাট্) অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাম কিছুই স্বীকার করিলেন না। কেবল ভয়ে ভয়ে গৃহের এক কোণে যাইয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবুরা অঘোরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রামচন্দ্র পলায়ন করিয়া জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ষ্টেসনাভিমুখে চলিলেন। ষ্টেসনে পৌছিতে কিছু বেলা হইয়া গেল। পরে টিকিট ক্রয় করিতে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকট যে কয়েকটী পয়সা ছিল, তাহাতে সঙ্কুলান হয় না। তখন তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, "গুলিখোর" বাবুরা কলিকাতা যাইবে বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রামকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "দুষ্ট বালক! তুমি না খাইয়া চলিয়া আসিলে কেন?" রাম তাহাদের নিকট টিকিটের পয়সা কম হইয়াছে বলিয়া জানাইলেন। বাবুরা

নেশাখোর হইলেও উদার-হৃদয়; রামকে টিকিট কিনিয়া দিলেন। রামও কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পাঠক! তুমি দশম বর্ষীয় রামের তেজস্বিতা—আপনার ভাব রক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার—দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা পর জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইয়া রামচন্দ্রের মহত্ত্বের এক প্রধান অংশবিশেষ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামচন্দ্রের পিতা নৃসিংহপ্রসাদ বিষয়-সম্পত্তি ও নারিকেলডাঙ্গার আবাসবাটী বিক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্রকে অবস্থার চক্রে পড়িয়া দারিদ্র্যের নিপীড়নে কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হয়। ইনি এ সময়ে জেনারেল এসেম্ব্লির ইনস্টিটিউসনে পড়িতেন। তথায় এণ্ট্রান্স ক্লাস অবধি পড়িয়া কাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। কাম্পবেল স্কুলে অনেকে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিল। সেখানকার শেষ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার প্রতাপনগরে কর্ম্ম হইয়াছিল। কিছু কাল পরে তিনি চল্লিশ টাকা বেতনে সরকারী কুইনাইন পরীক্ষকের সহকারী শ্রেণীর মধ্যে নিয়োজিত হন।

উচ্চ ব্রত হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা এ জগতে পরিভ্রমণ করেন, উচ্চ কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াই যাঁহারা জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিয়া যান, তাঁহাদের জীবনের কার্য্য-কলাপ বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যেন উচ্চ ভাবের বীজ তাঁহাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে নিহিত ছিল, কালে তাহা পরিবর্দ্ধিত ও ফলফুলে শোভিত হইয়া জগতের নয়নানন্দজনক ও পরিতৃপ্তিকর হইয়াছে। রামচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই সংস্কার ছিল, আপনার অর্থ-সামর্থ্য না হইতে হইতেই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সমূহ বিপদ সম্ভাবণ করিয়া আনা মাত্র। এই উচ্চভাব তাঁহার অন্তরে লুক্কায়িত ছিল বলিয়াই তিনি যে পর্য্যন্ত না উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত বিবাহের প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দরিদ্রের সংসার কি দুঃখেরই আবাসস্থল, তাহা রামচন্দ্র প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই আমরা আজ এই আদর্শ চরিত্রের, সামান্য হইলেও, আদর্শ ঘটনা সাধারণকে দেখাইতে সমর্থ হইতেছি। আজকালকার পিতামাতা ও অবিবাহিত যুবকেরা ইহা হইতে কিছু শিক্ষা করিবেন না কি?

বালাখানানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসুর একমাত্র কন্যার সহিত রাম-

চন্দ্রের বিবাহ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামচন্দ্র সরকারী কুইনাইন পরীক্ষকের সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সি, এচ, উড নামক একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কুইনাইন পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়া বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহারই নিকট অসীম পরিশ্রমের সহিত রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বাস্তবিক মহামতি উড সাহেবের শিক্ষার গুণেই, তিনি রসায়নের জটিল পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। সাহেবও বুঝিয়াছিলেন, যে আধারে তিনি শিক্ষার বীজ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বড় সামান্য নহে। অল্পদিন পরে যখন তিনি স্বদেশে গমন করেন, তখন তিনি রামচন্দ্রকে অন্তরের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ একটী (নিজের ও রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত) ঘড়ি ও বিবিধ পুস্তকাদি প্রদান করিয়া যান।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে কিরূপে একজন কাম্বেল স্কুলের ছাত্র আপনার অধ্যবসায়ের গুণে কঠিন রসায়ন-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়! রামচন্দ্র এই অল্পদিনের মধ্যে রসায়নে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সাহেবেরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মনিপুণতা দেখিয়া দিন দিন পদোন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্র কুর্চি নামক বৃক্ষের ছাল হইতে কুর্চিসিন নামক এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করেন। যেমন সিনকোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ হইতে কুইনাইন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কুর্চিসিনও সেইরূপ কুর্চির ছাল হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কুইনাইন জ্বরের অমোঘ ঔষধ; কুর্চিসিন রক্ত-আমাশয়ের ব্রহ্মাস্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুর্চিসিন আবিষ্কার করিয়া রামচন্দ্রের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্মেণ্টের নিকট ইহার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হয় এবং বিলাতের অনেক রাসায়নিক পত্রিকাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামচন্দ্র ক্রমে বিলাতের রাসায়নিক সভার সভ্য এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদিগের অধ্যাপক ও সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুবাজারস্থ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-মন্দির ও নানাবিধ সভাসমিতিতেও তিনি বিজ্ঞানের বক্তৃতা প্রদান করিতেন। কত বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী, কত ডাক্তার ও কত সাহেব বিবি তাঁহার নিকট রসায়নের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই; সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া

থাকেন, রামচন্দ্রের ন্যায় রসায়নশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অতীব বিরল। বিশেষতঃ তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তিনি যখন অত্যন্ত দুরূহ পরীক্ষা সকল প্রদর্শন করাইতেন, তখন বোধ হইত, যেন তিনি কোন ক্রীড়া করিতেছেন।

চল্লিশ টাকা বেতন হইতে ক্রমে তাঁহার দুইশত টাকা বেতন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আপনি বিবিধ পদার্থ পরীক্ষা করিয়াও তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এমন কি, কোন কোন সময়ে তিনি মাসে সহস্র মুদ্রাও গৃহে আনিতেন। চব্বিশ বৎসর সরকারী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কোন সাহেব তাঁহার কোন কর্ম্মে ত্রুটি দেখিতে পান নাই। সকলেই রামচন্দ্রকে দক্ষিণ হস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং প্রশংসার উপর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই রামচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবনে একটীও কালিমারেখা নাই—সমস্তই শুভ্র যশোরাশি-বিমণ্ডিত।

কিন্তু আমরা পাঠকগণকে রামচন্দ্রের জীবনের কেবল এই অংশ দেখাইয়া নিরস্ত হইব না। কিরূপে তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম তাঁহাকে সামান্য হইতে উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছিল, কিরূপে তিনি আত্মীয়স্বজনের অর্থে সামান্য বিদ্যালাভ করিয়া পরে আপনার যত্নে পণ্ডিতপ্রবর গণ্য হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চিত্র আমাদিগের ক্ষীণ লেখনীর ক্ষীণ চেষ্টায় ক্রমে চিত্রিত করিতে অগ্রসর হইব।

বিজ্ঞান পাঠ করিয়া রামচন্দ্রের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য তাঁহার হৃদয় হইতে বিদায় লইয়াছিল। দারুণ সন্দেহ আসিয়া সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল। তিনি নাস্তিক হইয়াছিলেন। অনেক লোক আছে, যাহারা সকলের সহিত তর্ক করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার জন্য নাস্তিক সাজিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাসে আঘাত করিয়াই ইহাদিগের আনন্দ। কিন্তু যখন বিপদের বিভীষিকাময়ী ছবি ইহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহারাই আবার কাতরস্বরে তেত্রিশ কোটী দেবতার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের নাস্তিকতা এ জাতীয় নহে। বাস্তবিক, তাহা অন্তস্তল হইতে উদ্ভূত। সরলতা ভিন্ন তাহাতে কপটতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি সকলের সহিত তর্ক করিতেন। সকলকে তাঁহার হৃদয় হইতে যুক্তিবলে নিরীশ্বরবাদরূপ কণ্টক উৎপাটিত করিবার জন্য আহ্বান করিতেন,

কিন্তু কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইত না। 'প্রকৃতি বিশ্ব প্রসবিনী; মৃত্যুর সহিত মনুষ্যের সকলই ফুরাইয়া যায়; রামচন্দ্রের ইহাই বিশ্বাস ছিল। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত সকল দর্শন করিয়া, ঈশ্বর, বা পরকাল যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে রামচন্দ্র নিরীশ্বরবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সরল কুটযুক্তি প্রদর্শন এবং যে সকল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া যাইত। অনেকে, পাছে আপনারাও তাঁহার সহিত নাস্তিক হইয়া যান, সেই ভয়ে তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন না।

আমরা এই স্থানে একটী সামান্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন রামচন্দ্র ট্রাম গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আপনার কর্ম্মস্থান মেডিকেল কলেজে যাইতেছিলেন। তখন প্রায় বেলা দশটা। গাড়ীতে লোকসংখ্যা অত্যন্তই অধিক। রামচন্দ্র অতি কষ্টে সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সহসা পশ্চাৎ দিক্ হইতে কোন ব্যক্তির উচ্চকণ্ঠের শব্দ তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন বাঙ্গালী বক্তৃতা দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রামচন্দ্র কথার ভাবে বুঝিলেন যে, উক্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এই শ্রেণীর খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকেরা যে স্থানে দুই দশজন একত্রিত হন, সে স্থানে প্রায় বক্তৃতা না দিয়া থাকিতে পারেন না। ট্রামগাড়ীতে পঞ্চাশ, ষাট জন ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার বক্তৃতা করিবার সাধ হৃদয় হইতে উছলিয়া উঠিতেছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! একটা কথা বলি, শোন। তোমরা করিতেছ কি? আহার করিয়াছ, আফিস যাইতেছ, কিন্তু পরিত্রাণের করিলে কি? জান না কি, মরিতে হইবে? মরিলে, তোমাদের কি দশা হইবে? তখন কে তোমাদের ত্রাণ করিবেন? তাই বলি, যীশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও। যীশু ভিন্ন তোমাদের পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।"

যৌবনে মানুষ প্রায়ই রহস্যপ্রিয় হইয়া থাকে। খ্রীষ্টিয়ান বাবুটী বক্তৃতা করিতেছিলেন। অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ, বিরক্ত হইলেও কিছুই বলিতে সাহসী হইতেছিলেন না। রামচন্দ্র কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সহসা করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! মরিলে, পরিত্রাণের যাহা

হয় হইবে, আপনি ত এ যাত্রা পরিত্রাণ করুন। আপনার বক্তৃতার জ্বালায় যে প্রাণান্ত উপস্থিত!" রামচন্দ্রের এই যৌবনসুলভ রহস্য শুনিয়া অন্যান্য সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রচারক অপ্রতিভ হইলেন। রামচন্দ্রের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের অন্য উপায় না দেখিয়া কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রচারকও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রামচন্দ্র কলেজের ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রচারক মহাশয়ের ইচ্ছা যে, রামচন্দ্রের কর্ণে দুই চারিটী খ্রীষ্টের মহিমা-গীতি গাহিয়া, তাঁহাকে সনাতন ধর্ম্মে আনয়ন করেন। তাঁহাকে যীশুখ্রীষ্টের পরিত্রাণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাও কহা হইল। রামচন্দ্র কিন্তু বলিলেন, "মহাশয়! আপনি অত কি কতকগুলো বলিতেছেন? আমি যে কিছুই মানি না। ঈশ্বর, পরকাল, ইত্যাদি কিছুতেই আমার বিশ্বাস নাই।" তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির গোলাগুলি বিশেষ করিয়া বর্ষণ করিতে হইল না। তাঁহার দুই একটী কথা শুনিয়াই খ্রীষ্ট উপাসকের বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইবার উপক্রম হইল। সহজে কেহ আপনার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে চাহে না; কেননা, তাহাতে এক প্রকার ভালবাসা জন্মিয়া যায়। তিনি নাস্তিকের কূটযুক্তির প্রবল হিল্লোলে, আপনার বিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য কোনমতে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। পরে, আরও দুই একবার রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু যতবারই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, ততবারই তিনি তাঁহার সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র এইরূপ অনেক প্রচারক ও পণ্ডিতের সহিত বাক্যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু কোন মতেই কেহ তাঁহার হৃদয় হইতে ঈশ্বর অবিশ্বাসের আবর্জ্জনা দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। রামচন্দ্রেরও যে এ সময়ে ঈশ্বরের বিষয় জানিবার জন্য প্রাণের ভিতর বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, এই ভগবানের রাজ্যে কাহারও কোন বিষয়ের জন্য অন্তরের প্রয়োজন হইলে, তাহা পরিপূর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না।

রামচন্দ্র একদিকে যেমন বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে মস্তিষ্ক নিয়োজিত রাখিয়া গভীর চিন্তায় ভাসিতেন, অপর দিকেও তেমনি মনের প্রফুল্লতার

অনিষ্ট সাধন না করিয়া অবসর সময়ে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত হই তেন। এই সময়ে তিনি একটী সখের যাত্রার দলের পরিচালক ছিলেন অভিনয়, নাটক রচনা প্রভৃতি বহুবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার তাঁহারই উপ ন্যস্ত ছিল। অভিনীত বিষয়ে নায়কের অভিনয় প্রা তাঁহাকেই করিত হইত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া গ্রামে উক্ত যাত্রার দলের আখড় ছিল। রামচন্দ্র কলিকাতা হইতে বেলঘরিয়ায় যাইয়া যাত্রার আখড়া দিতেন আশ্চর্য্য উৎসাহও বটে!

এখনও তাঁহার দুই একজন বন্ধুকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সময়ে তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন রামচন্দ্র সুন্দর অভিনয় করিতেন। তাঁহার "জয়দ্রথ বধে" অর্জ্জুনের "মোহন্তের এ কি কাজে" এলোকেশীর পিতার অভিনয় এখনও অনেকে স্মৃতিতে জাগিয়া আছে এবং অল্পদিনের ঘটনা বলিয়া বোধ হয়।

তিনি এ সময়ে অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন এবং দুই একখানি মুদ্রিতও করিয়াছিলেন। সে সকল পুস্তক আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না তিনিও কোনখানি যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন নাই। না রাখিবারও কারণ ছিল তিনি ত আর কষ্ট করিয়া রচনা করিতেন না—ক্ষিপ্র হস্তেই কার্য্য সমাধা করিতেন। আরও, পরজীবনে ধর্ম্মের তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠিয়া তাঁহার আর এ সকল তুচ্ছ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না। যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচিত দুই একটী সঙ্গীত বহুকষ্টে স্মরণ করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইতেন। রামচন্দ্রের রচনা কিরূপ লালিত্য গুণবিশিষ্ট ও ভাবপূর্ণ, তাহা পাঠকগণ নিম্নলিখিত গীত হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোন নায়িকা তাঁহার প্রাণেশ্বরের বিরহের ব্যথা তাঁহার সখীকে জানাইতে ছিলেন। নায়কের নাম ভূষণ ও সখীর নাম গোলাপ।

গীত।

(গোলাপ) ভূষণ আমার অঙ্গের ভূষণ।
ছাড়িয়ে সে জনে, যাইব কেমনে,
মরি মরি প্রাণে তাহারি কারণ॥
লোক লাজ ভয়ে প্রাণের রতনে,
বিসর্জ্জন দিব বল কোন্ প্রাণে,

শয়নে স্বপনে, সে মনোমোহনে,
হৃদয়-কাননে, করি দরশন ॥
এসব যন্ত্রণা সহিতে গো পারি,
নাথের বিরহ সহিতে যে নারি,
কি করিব হায়, যাইব কোথায়,
তা'র সনে হ'বে কেমনে মিলন ॥
যা' হ'বার হ'বে করিয়াছি পণ,
যদি পাই নাথে রাখিব জীবন,
নতুবা জীবনে, প্রবেশি জীবনে,
কিম্বা বিষপানে, কর্‌ব সমাপণ ॥

পৌরাণিক বিষয় লইয়া অভিনয়াদি করিতেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, রামচন্দ্রের পুরাণোক্ত দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিক তাহার কিছুই নহে। তিনি যে নাস্তিক, সেই নাস্তিকই ছিলেন; কেবল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই তাঁহার এই নাটকাভিনয়। বাল্যকালের দেবতানুরক্তি, দেবসেবায় আসক্তি বিজ্ঞানের খরতাপে অদৃশ্য হইয়াছিল। ইংরাজী বিদ্যা তাঁহার এইরূপ ভীষণ মানসিক পরিবর্ত্তন সাধিত করিলেও ইংরাজী আচার-ব্যবহার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আজকাল অনেককেই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ম্লেচ্ছাচারে দূষিত হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ, আহার সম্বন্ধে অনেকে হিন্দুয়ানীর কঠোর নিয়মের ভিতরে থাকিতে চাহেন না। রামচন্দ্র নাস্তিক হইলেও, আপনার পিতৃপিতামহের বৈষ্ণবাচার পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি জীবনে কখনও মাংস ভোজন করেন নাই এবং তাঁহার বাটীতেও কখন মাংস প্রবেশলাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এক সময়ে তাঁহার পত্নী কোন বিষম পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাহাতে ডাক্তারেরা মাংসের ঝোল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী মরিয়া যায় যাইবে, তথাপি আমি মাংস বাটীতে আনিয়া কুলাঙ্গার হইব না।" সৌভাগ্যক্রমে বিনা মাংসভোজনেই তাঁহার স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে কর্ম্ম হইবার পর, চারি পাঁচ বৎসর রামচন্দ্রের এইরূপ নাস্তিকভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সংসারে তাঁহার কোন অভাবই ছিল না। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং আত্মীয় স্বজন

ও সুহৃদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সুখেই দিন যাপন হইয়া যাইত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনময় জগতে চিরদিন কখন সমান ভাবে যায় না। রামচন্দ্র ক্রমে সংসারের দুঃখময় মূর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহার প্রাণসমা কন্যার মৃত্যুতে তাঁহাকে শোক-সাগরে মগ্ন হইতে হইল। এতদিন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সহসা তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল। একটু একটু করিয়া মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার হৃদয়-পটে আসিয়া উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। শোক অনেক সময়ে মনুষ্যের নয়ন উন্মীলন করিয়া দেয়, এই জন্যই অনেক গ্রন্থকার ইহার গুণগান করিয়া থাকেন। প্রিয়জনের মৃত্যুতে চিন্তার স্রোত প্রবলবেগে আসিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়কে আক্রমণ করিল। বিষাদের সহিত তাঁহার প্রাণে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ঔদাস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধ হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল যে, এরূপ মহান্ জীবন নিরীশ্বরবাদে বিনষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অথবা, এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনে বিবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া জগতের জীবগণকে শিক্ষা প্রদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, রামচন্দ্রের জীবনের এক অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইয়া, আর এক অঙ্ক আরম্ভ হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে আজ প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল। কালীপূজার শুভদিনের অপরাহ্ন। কলিকাতা সহরের যত হিন্দু-গৃহ দীপাবলীতে বিভূষিত হইতেছে। আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত এখনও কৃষ্ণা যামিনীর অন্ধকাররাশি আসিয়া পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে নাই। তপনদেব অস্তাচলে যাইবার পূর্ব্বে বিবিধবর্ণে গগনমণ্ডল রঞ্জিত করিতেছিলেন। দিবসের প্রখরালোক ও রাত্রির গভীরান্ধকারের মধ্যবর্ত্তী, সে সময়ে আকাশ এবং যাবতীয় পার্থিব পদার্থ এক অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত হইয়া ভাবুকের হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। রামচন্দ্র গৃহের ছাদের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া দীপগুলি সজ্জিত করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে আপনার শোকভার-নিপীড়িত হৃদয়ের লঘুতা বিধানের জন্য অন্তরীক্ষের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রামচন্দ্র প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির পূজা করিয়া—প্রকৃতির কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াই নিরীশ্বরবাদী হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃতির সেই বিবিধ-রাগ রঞ্জিতা সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়মাঝে চিন্তারাশির অভ্যুদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু সে সময়ে তাঁহার চিন্তার গতি এমন দিকে ধাবিত হইল, যাহাতে তাঁহার জীবনে এক মহান পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতে লাগিল। প্রকৃতি, আজ তাহার

প্রিয় ভক্তের নয়ন উন্মীলন করিয়া দিয়া, তাহাকে জগতের অধীশ্বরের দিকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

সহসা আকাশে বিচিত্র মেঘখণ্ড সকল উদিত হইয়া বায়ু সঞ্চালন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই মেঘগুলির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মেঘ কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে। বিজ্ঞান তাঁহাকে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু সমুদ্রের বারিরাশির উৎপত্তির স্থান কোথায়? রামচন্দ্র, রূঢ় বাষ্প, অণু, পরমাণু কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। মেঘ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য বস্তুর চিন্তায়ও তাঁহার চিত্ত প্রধাবিত হইল। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় এই অনন্ত জগ-মণ্ডলের অনন্তভাবে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি চিন্তা-সাগরে পড়িয়া কোথাও কূল দেখিতে পাইলেন না। কি জানি ভগবানের কোন্ কৌশলে আকাশের মেঘ দেখিয়া তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেও ত অসংখ্যবার জলধরের মনোরম ও ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৈ কখনত এরূপ ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই? রামচন্দ্রের সন্দেহ হইতে লাগিল, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কি কেহ অধিপতি আছেন? জগতের কোটী কোটী প্রাণী ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া ফিরিতেছে, তাহারা কি বাস্তবিকই ভ্রান্ত? যদ্যপি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে কি দেখিতে পাওয়া যায়, না কেবলই অনুমানের কথা? যদ্যপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তাহাও কি ইহ জীবনে? রামচন্দ্র, ঈশ্বর আছেন কি না, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় কি না, জানিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিব, স্থির করিলেন। এত দিন কেবল লোকের সহিত তর্কই করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌কে জানিবার এইরূপ দৃঢ় সংকল্প হয় নাই। এতদিন মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন জগদীশ্বর নাই, কিন্তু আজ প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া তাঁহার প্রাণে সন্দেহ ও অশান্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। সামান্য ঘটনা হইলেও, কিসে যে মনুষ্যের জীবনে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

রামচন্দ্র সেই দিন অবধি ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতবেশধারী প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর আছেন কি না, যদ্যপি থাকেন, তাহা

হইলে, তাঁহার দর্শন পাইবার উপায় কি ?” সকলেই প্রত্যুত্তরে বলিতেন, ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভের উপায় কেহই বলিয়া দিতে সক্ষম হইতেন না। যাঁহারা কিঞ্চিৎ চতুর, তাঁহারা তাঁহাকে বহু জন্মব্যাপী সাধনের কথা বলিতেন, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রাণ তাহাতে প্রবোধ মানিত না। তিনি বলিতেন, “যখন কোথা হইতে আসিয়াছি, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই—তাহার বিষয় কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, তখন কোথায় যাইব তাহারই বা স্থিরতা কি ? ইহ জন্মে যগুপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইলে না হয় যাহা করিতে বলিবে করিতে পারি।” তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই নীরব হইতেন।

রামচন্দ্র যখন এইরূপ ভগবানের বিষয় জানিবার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিপীড়নে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন তাঁহার বাটীতে তাঁহাদিগের কুলগুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মানসিক অশান্তির সময়ে কুলগুরুর আগমন তাঁহার নিকট শুভলক্ষণ বলিয়া বোধ হইল। আশার আশ্বাস বাক্যে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, বুঝি বা বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধকাররাশি গুরুর উপদেশবলে, তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তিনি গুরুদেবের যথাবিধি অভ্যর্থনা ও সম্মানাদি করিলেন। পরে সময়ক্রমে তাঁহার নিকটে আপনার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, “মহাশয়! আমি বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর আছেন কি না, সে সম্বন্ধে আমার দারুণ সন্দেহ। আপনি আমায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় বলিয়া দিতে পারেন কি ?” গুরু, তাঁহার ভাবী শিষ্যের এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণ ও অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দর্শন করিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চতুর সহচর বলিয়া উঠিল, “মহাশয়! উনি ও সব অত জানেন না। ওঁর করণ কারণ ভালরূপ জানা আছে।” রামচন্দ্র নিরাশা-নীরে নিমগ্ন হইয়া যাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গুরুদেব তাঁহার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিতে পাইতেছেন না, গুরু তাহা দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সে আশা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। গুরুও আশা করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া সুখী হইবেন। যদিও তিনি সে কার্য্যে বিফলমনোরথ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কার্য্যের ফলভোগে বঞ্চিত হইলেন

না। কেন না, রামচন্দ্র চিরদিনই গুরুকুলের সকলকেই তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না; বরং তাঁহারা আশাতিরিক্ত প্রয়োজনসিদ্ধি হইতেছে দেখিয়া প্রীতই হইতেন।

কুলগুরু কিছু করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়-গণের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সংশয়রাশি ও অশান্তি বিদূরিত হইল না। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক-গণের সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত না। পরে একদিন কোন যোগাচারী ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করাতে, তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "বাপু! তোমার যে রোগ, তাহাতে ডাক্তার বৈদ্য কি করিবে? স্বয়ং শিব ভিন্ন কেহই তোমার আরোগ্য করিতে পারিবে না। একমাত্র তিনিই তোমার মনের সন্দেহ ঘুচাইতে সমর্থ।" রামচন্দ্র তখন কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তির দূরদর্শিতা নিতান্ত সামান্য নহে।

যখন রামচন্দ্রের প্রাণের ভিতর এইরূপ অভাবের ভাব নিশিদিনই বিরাজ করিত এবং যখন তিনি তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেই সময় একদিন দক্ষিণেশ্বরস্থ রামকৃষ্ণদেবের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন সাধু আছেন। সহসা তাঁহার কথা স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া জনৈক আত্মীয় মনোমোহন মিত্র ও একজন বন্ধু গোপালচন্দ্র মিত্রের সহিত দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। এতদিনের পর তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইতে চলিল! এতদিনের পর তাঁহার দুঃসাধ্য অশান্তি রোগের সুব্যবস্থা হইবার উপায় হইল! এতদিনের পর প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য তিনি সুশীতল নির্ঝরের সন্নিহিত হইলেন!

রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়া, রামকৃষ্ণদেব কোন্ গৃহে থাকেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন। গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। কি বলিয়া ডাকিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি ভিতর হইতে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। রামচন্দ্র গৃহের

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সাধুর বেশভূষার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। গৈরিক বসন নাই, বাঘ ছাল নাই, কমণ্ডলু নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মন প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া যাইল। পাঠক! তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, ইনিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

রামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্র ইত্যাদিকে দর্শনমাত্রেই নারায়ণ বলিয়া নমস্কার করিলেন এবং উপবেশন করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র উপবেশন করিলে পর, তিনি মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "হাঁগা। তুমি না কি ডাক্তার? আমার হাতটা দেখ না!" রামচন্দ্র বিস্মিত। মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, তাঁহার বদনচন্দ্রিমার পানে চাহিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব হাসি হাসি মুখে মধুরস্বরে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র আর সে পূর্ব্বের রামচন্দ্র রহিলেন না—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার জীবনে একটা মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যাইল।

সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অন্ধকাররাশি কোন গৃহে সঞ্চিত হইয়া থাকিলেও যেমন তাহা দীপ আনয়নমাত্রেই দূরীভূত হইয়া যায়, অথবা কোন গৃহ-পরিপূর্ণ বারুদ, অত্যধিক হইলেও, যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শেই ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্রের হৃদয়-নিহিত নাস্তিকতা রামকৃষ্ণদেবের দর্শনমাত্রেই তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি ভগবানের বিষয় জানিবার জন্য দারুণ পিপাসায় আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্রই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া তাঁহার প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির ভাব আবির্ভূত হইল। বাস্তবিক, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের কি অপার মহিমা, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব? যাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে উপদেশ শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাহা প্রাণের ভিতর অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ যে, আর তাহা তাঁহার সেই মধুর ভাবে ও মধুর ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রামচন্দ্রকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই (রামচন্দ্রেরই) ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমরা যখন তাঁহাকে, ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে একটীও তারা দেখা যায় না; সেই জন্য তারা নাই, এই কথা বলা যায় না। দুগ্ধে মাখন আছে, দুগ্ধ দেখিলে কি মাখনের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখন দেখিতে

হইলে, দুগ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মন্থন করিলে, (ইচ্ছামত সময়ে হইবে না) মাখন বাহির হইয়া থাকে। যেমন কোন বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে হইলে, অগ্রে যাহারা তাহাতে মাছ ধরিয়াছে, তাহাদের নিকট কেমন মাছ আছে, কিসের টোপ খায়, কি চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া থাকে; ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, পরে সে 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পায়; তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাঁথিয়া ফেলে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই প্রকার। সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম টোপে, ভক্তি-চার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ঘাই ও ফুট' দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আমরা ঈশ্বরই মানিতাম না, তাঁহার রূপ দেখা যাইবে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

আমাদের এই ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর নাই। যদি থাকেন, আমাদের ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের মতে তাহা নিরাকার; ব্রাহ্মসমাজে বেড়াইয়া তাহা শুনিয়া রাখিয়াছি। বিশ্বাস হইবে কিরূপে? পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁহার মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে পাইবে। আমরা কহিলাম, সব সত্য, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে? কিন্তু এই জন্মে কি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, "যেমন ভাব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যয়"—বলিয়া একটী গীত গাহিলেন।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা-হ্রদে, চিত্ত ডুবে রয়।
(যদি চিত্ত ডুবে রয়।)
তবে জপ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়॥

যে দিকে যত যাওয়া যায়, বিপরীতদিক্ তত পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দশ হাত গমন করিলে পশ্চিমদিক্ দশ হাত পশ্চাৎ হইবেই

হইবে। আমরা তথাপি বলিলাম যে, 'ঈশ্বর আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে, দুর্ব্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। পরমহংসদেব বলিলেন, সান্নিপাতিক রোগী এক পুকুর জল পান করিতে চায়, এক হাঁড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথায় কাণ দেন? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না, ডাক্তার রোগীর কথায় তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? জ্বর পরিপাক পাইলে, ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়া থাকেন। ' রোগীকে আর কিছু বলিতে হয় না।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই রামচন্দ্রের মন প্রাণ অপহৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও সমস্ত মানসিক কার্য্যই এক প্রকার রামকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন ও তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। সপ্তাহকাল যদিও তাঁহার সহিত দর্শন হইত না, তথাপি তাঁহার বিষয় চর্চ্চা করিতে করিতেই দিনগুলি সুখে ও শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যাইত। রামচন্দ্র বলিতেন, "রবিবার সন্ধ্যার সময় যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া আমরা একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম। ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম—

"গৃহে ফিরে যেতে মন চাহেনা যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার॥"

রামচন্দ্র যদিও রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে আস্তিক হইয়াছিলেন, যদিও রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়জন বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় নাই। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার কিছু-দিন বেশ আনন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু তৎপরে আবার ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহার মনকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে তিনি একদিন নিশাশেষে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যেন কোন এক পূর্ব্ব-পরিচিত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া উঠিলেন। পরে রামকৃষ্ণদেব নিকটে আসিয়া তাঁহাকে একটী মন্ত্র প্রদান করিলেন ও প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে একশত বার জপ

করিবার জন্য বলিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর তাঁহার সর্ব্ব শরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত রামকৃষ্ণদেবের নিকট ব্যক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণদেব স্বপ্নের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে বলিয়াছিলেন—

"স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তার ঠাঁই।"

পরে স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া তাঁহাকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যদিও ঠাকুরের নিকট হইতে উক্ত প্রকার আশ্বাস-বাক্য প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তাঁহার বিজ্ঞান-বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক স্বপ্নের যথার্থতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে পারিল না। স্বপ্ন কি কখন সত্য হইতে পারে? ইহা মস্তিষ্কের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন কোন বিষয় রাত্রিদিন চিন্তা করিলে স্বপ্নে সেই বিষয়ের কিছু না কিছু মানস-পটে আসিয়া প্রতিফলিত হয়। "উদর উষ্ণ" হইলেত স্বপ্নে কত কি দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল কি সত্য? রামচন্দ্রের মনে এইরূপ বহুবিধ সন্দেহ-রাশি একটী একটী করিয়া উঠিতে লাগিল এবং তিনিও একটু একটু করিয়া অশান্তি-সাগরে ডুবিতে লাগিলেন।

অনুমানে কি ফল! অনুমানে কি ফল! প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রয়োজন! এই কথা কে বার বার তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কহিতে লাগিল। আবার চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তিনি চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। আবার তাঁহার মনে হইল, ভগবান্ কি নাই? তাঁহার দর্শন কি পাওয়া যাইবে না? তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে আকুল করিতে লাগিল। জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন বলিয়া কি হইবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে, আকাশ-কুসুমও যাহা, ঈশ্বরও তাহা; উভয়ের পার্থক্য কোথায়? এবার তাঁহার নিকট আকাশ বায়ুশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ের আকুলতা তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু যাহার ঈশ্বরের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা হয়, তাহার কি তাহা দূরীভূত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে? সরল প্রাণে যে তাঁহাকে জানিতে চায়, তাঁহাকে জানিবার জন্য যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ না হইলে যে ভগবানের করুণাময় নামে চিরকলঙ্ক রহিয়া যাইবে! রামচন্দ্র যখন এইরূপ চিন্তাচক্রে পড়িয়া নিপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার

হৃদয়েশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি, পাঠকগণ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

রামচন্দ্র যে উক্ত প্রকার সংশয়-যাতনায় একদিন জর্জরিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। এইরূপ ক্লেশ কিছুদিন তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আকাশ কখন বিভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকলে সমাচ্ছন্ন হয়, কখনও মুষল ধারার আঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, কখনও আবার বজ্রপাতের বিষম নিনাদে কম্পিত হয়, কিন্তু আকাশের এ অবস্থা চিরদিন থাকিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মের গুণে কালমেঘ কোথায় চলিয়া যায়, বারিপাতে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, বজ্রাঘাতও নিরস্ত হয়। আবার সূর্য্যদেব উদিত হইয়া আকাশকে কিরণমালায় ভূষিত করেন, আকাশ আবার মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিতে থাকে। মানুষের মানসাকাশেও এইরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কুচিন্তা কালমেঘে আবৃত, কখন যুক্তিতর্কের বজ্রাঘাতে ব্যথিত, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার সুখসূর্য্য অভ্যুদয়ে আলোকিত ও আনন্দিত। কিন্তু জড়রাজ্যের নিয়মে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক রাজ্যে ঠিক তাহা না হইলেও হইতে পারে। কেন না আমরা দেখিতে পাই, মেঘের পর সূর্য্য এবং সূর্য্যের পর পুনরায় মেঘও আকাশে আসিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিয়া একবার কাহারও হৃদয় হইতে দুঃখরাশি দূর করিয়া দিলে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সুখসূর্য্য তাহার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য বিরাজ করিতে পারে। পুনরায় সে দুঃখে না পড়িতেও পারে।

একদিন বেলা এগারটার সময় রামচন্দ্র পটলডাঙ্গার গোলদীঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দণ্ডায়মান হইয়া জনৈক বন্ধুর নিকট মনোদুঃখ ব্যক্ত করিতেছিলেন। তাঁহারা যেরূপ ভাবে কথা কহিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পার্শ্ব হইতে কোন ব্যক্তি যে তাহা শুনিতে পাইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। সহসা একজন দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে রামচন্দ্রকে কহিল, "ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, স'য়ে থাক।" রামচন্দ্র বন্ধুর নিকটে আপনার অশান্তিময় হৃদয়ের কথাই কহিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তির এই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কে তাঁহাকে এইরূপ মধুর স্বরে আশা প্রদান করিল, ভাল করিয়া জানিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতেই

আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যেন সেই ব্যক্তি আকাশে অদৃশ্য হইয়া যাইল। তাঁহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চতুর্দ্দিকের রাস্তাই অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। রামচন্দ্রের মনে এইবার নানারূপ চিন্তা আসিতে লাগিল। "এ ব্যক্তি কে? কোথায়ই বা চলিয়া গেল? আমরা দুইজনে প্রত্যক্ষ দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে আসিল। আমার প্রাণের কথাই বা সে জানিল কিরূপে? 'ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, স'য়ে থাক' এরূপ প্রাণ-জুড়ান আশ্বাস বাণী বলিল; তাহাও আমরা দুইজনে শুনিলাম! ইহাকে কি মস্তিষ্কের বিকার বলিব? তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি? দুইজনেই কি এক সময়ে ভ্রমে পড়িলাম? মস্তিষ্কের বিকার বলিলে, এইরূপ বিকারকেও ধন্য!" রামচন্দ্র মনে মনে এইপ্রকার নানারূপ প্রশ্নের আন্দোলন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রাণে একপ্রকার শান্তিলাভ করিলেন, পরে রামকৃষ্ণদেবের নিকট এই-রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "অমন কত কি দেখিবে!"

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের সংসারের প্রতি বিরক্তির ভাব আসিয়াছিল। তিনি রামকৃষ্ণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। রামচন্দ্রও ঠাকুরের কথায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

যদিও পূর্ব্বকথিত আশ্চর্য্য ঘটনার পর তাঁহার প্রাণ স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও কিছু দিনের জন্য। অল্পদিন পরেই তাঁহার পুনর্ব্বার ব্যাকুলতা আসিয়াছিল। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইয়া দুঃখের পসরা খুলিয়া বসিলেন, অনেক অভাব অভিযোগের কথা বলিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার নিকট কোন আশাপ্রদ কথা শুনিতে পাইলেন না। রামকৃষ্ণদেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কি করিব বাপু! সকলই হরির ইচ্ছা।" রামচন্দ্র তখন বলিতে লাগিলেন, "আপনি অমন কথা বলিলে কোথায় যাইব?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি কাহারও খাইও না, নিও না; তোমা-দের এখানে আসিতে ইচ্ছা হয়, আসিও, না হয়, আসিও না।" রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট এইরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন! তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার চরণপ্রান্তে আপনাকে চিরদিনের জন্য বিক্রীত করিয়াছিলেন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়জন

বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহার মুখ হইতে এই কঠোর বাণী তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। রামচন্দ্র প্রেমিক। প্রেমিকেরা প্রায়ই অভিমানী হইয়া থাকে। অভিমানে তিনি প্রথমে ভাগিরথী-গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দিবেন সংকল্প করিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা কিছুক্ষণ পরেই পরিবর্ত্তিত, হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! শুনিয়া থাকি, তোমা অপেক্ষা তোমার নামের মহিমা অধিক। তুমি আপনিই আমায় সেই নাম প্রদান করিয়াছ, তাহার শক্তি কত দূর, আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" এই বলিয়া তিনি ঠাকুরের গৃহের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া রহিলেন এবং নাম জপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। পরে সহসা গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া রামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নানাবিধ স্নেহপূর্ণ বাক্যে তাঁহার অভিমান ভঙ্গ করিয়া দিয়া ভক্তসেবা করিতে বলিলেন।

ভক্তেরা মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহাদিগের আপন আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং অন্যান্য ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসবাদি করিতেন। ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র একবার ঠাকুরকে আপন বাটীতে আনিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন থাক।" উক্ত ঘটনার পর রামকৃষ্ণদেব আপনিই রামচন্দ্রের বাটীতে যাইবার দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিও স্বীকৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাটীতে আনিয়া মহোৎসবাদি করা কিছু ব্যয়সাধ্য ভাবিয়া রামচন্দ্র তৎপরে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে ভাবের মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল। এই সময়ে কোন বিশেষ কারণে তাঁহার বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছিল। তিনি একদিন নিশাশেষে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভুকে বাটীতে আনিয়া মহোৎসব করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার এত উপার্জ্জন হইতেছে, সে কেবল ঠাকুরের মহোৎসব করিবার জন্য। ঠাকুরই তাঁহাকে আপনার কার্য্যের জন্য, অন্য উপলক্ষ করিয়া অর্থ প্রদান করিতেছেন। এই কথা মনে হইবামাত্রই রামচন্দ্র আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। "ছি, ছি, প্রভুর অর্থ লইয়া আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, করিতেছি কি?" এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া তিনি বিশিষ্টরূপে ভক্তসেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে

দেখিতে ঠাকুরের আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিন (বৈশাখী পূর্ণিমা—ফুলদোল) আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র মহা সমারোহে মহোৎসব করিয়া ভক্তসেবা করিলেন। প্রভু রামকৃষ্ণদেবও রামচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া আনন্দের হাট-বাজার বসাইয়া যাইলেন। শুভতিথি ফুলদোলের দিন ঠাকুর তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র ফুলদোলকে চিরজীবন মহা সৌভাগ্যের দিন বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং প্রতি বৎসর সেই দিবস শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিয়া মহোৎসবাদি করিতেন। কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে আজও তাঁহার শিষ্যেরা ফুলদোল পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন এবং সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে বিশেষ পূজা করিয়া থাকেন।

ফুলদোলের পরদিন রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইলেন। ঠাকুরের সহিত নানাবিধ তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে করিতে প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। রামচন্দ্র তখন গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের গৃহের নিকট হইতে চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে সহসা ঠাকুর গৃহের ভিতর হইতে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "কি চাও?" কি চাও কথাগুলি তাঁহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল। যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রভু সম্মুখে কল্পতরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অভীষ্ট প্রদান করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন! রামচন্দ্র আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "কত লোকত ইঁহার নিকট আসিয়া থাকে, কত লোকত কত তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু কাহা-কেও কি ইনি এরূপভাবে কৃপা করিয়াছেন? কৈ কেহইত বলেনা যে, কোন বিষয়ে কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছে।" রামচন্দ্র আর এ বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। কি চাহিবেন ভাবিতে লাগিলেন। কামিনী-কাঞ্চন, সম্মান ইত্যাদি একে একে তাহাদের আপন আপন নয়ন-বিমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি সাধনলব্ধ শক্তিসকলও তাঁহার মানসক্ষেত্রে মোহজাল বিস্তার করিতে অগ্র-সর হইল, কিন্তু তাহারাও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রামচন্দ্র সংসারের সুখ কি ভালরূপে জানিয়াছিলেন; এবং জানিয়াছিলেন বলিয়াই হা ভগবান্! হা ভগবান্! বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণের চরণে যাইয়া আশ্রয়

লইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের কৃপায় ধর্ম্মরাজ্যের‌ও অনেক বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রভুর পাদপদ্মের নিম্নে বসিয়া তাঁহার শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ-পুরুষদিগের অবস্থা দেখিতে বাকি ছিল না; সুতরাং উভয় পক্ষের সুখের পরিণাম কি, তাহা বিচার করিতে বিলম্ব হইল না। কি চাহিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "প্রভু! আপনার নিকট কি চাহিব, তাহা আমি কিছুই জানিনা। কি চাহিতে হয়, আমায় বলিয়া দিন।" তখন রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুমি স্বপ্নে যে মন্ত্রটী পাইয়াছ, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ কর। আজ হইতে তোমার সাধন ভজনের শেষ হইল। তোমায় আর কিছুই করিতে হইবে না। যদি কিছু দেখিবার ইচ্ছা হয়, ত আমায় দেখ ও যখন এখানে আসিবে, তখন আমার জন্য এক পয়সার যাহা হয়, কিছু কিনিয়া আনিও।" রামচন্দ্র আজ কি অমৃতময়ী বাণীই শুনিলেন! যে প্রাণের আরাধ্য দেবতা তাঁহার নিকটে থাকিলেও তিনি চিনিতে পারেন নাই, আজ তিনি স্বয়ং আপনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন! রামচন্দ্রের প্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যাইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রণতভাবে রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন্ত্রটী মনে মনে পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় প্রদান করিলেন। প্রভু ভাবাবেশে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ রামচন্দ্রের ব্রহ্মতালুতে স্পর্শ করিলেন। রাম বাহ্যসংজ্ঞাবিহীন হইয়া কি দেখিতে লাগিলেন, কি বুঝিতে লাগিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য অথবা লেখনী পরাস্ত হইয়া যায়। তাহা প্রাণের উপলব্ধির বিষয়, সুতরাং নিজ জীবনে তাহা সংঘটিত না হইলে তাহা অনুধাবন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই দিন হইতেই অশান্তি রামচন্দ্রের হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। এই দিন হইতেই রামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান জন্মিয়া গেল। এই দিন হইতেই তিনি এই সুখদুঃখময় সংসারের উত্থান পতনের আঘাতক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ভক্তসেবা করিতে বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহা আপনার জীবনের মহাব্রতে পর্য্যবসিত করিলেন। ভক্তসেবা তাঁহার জীবনব্যাপারের এক অঙ্গবিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আসিতেন এবং রামচন্দ্রও সে সময়ে মহোৎসব করিতে ত্রুটি করিতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন ভক্ত সমাবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গের আলোচনাদি করিতেন এবং

প্রত্যহই তিনি অকাতরে প্রীতির সহিত তাঁহাদিগের গুরুতর জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। বাস্তবিক ভক্তেরা যে তাঁহার কি আদরের সামগ্রী ছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছে। তাঁহার পরজীবনে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, যে একবার যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের সম্মুখে প্রণত হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি কি না করিতে উদ্যত হইতেন? শরীরে, অর্থে, বাক্যে, মনে, যে কোন প্রকারে হউক, তাহার উপকারের বা অভাব মোচনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। যে তাঁহার অতিশয় ঘোর শত্রু, সেও যদ্যপি একবার "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া মন্দিরের সম্মুখে মস্তক অবনত করিত, তাহাকেও তিনি আপনার সহোদরের ন্যায় আলিঙ্গন প্রদান করি-তেন। ভক্তেরা তাঁহার নিকট যে যখন যাহাই চাহিত, সে তখনই তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইত।

রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীও আদর্শ হিন্দুরমণী, স্বামীর চির অনুগামিনী। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সেবাকার্য্যে তিনিও মহাব্রতী। চিরদিন ভক্তদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় যত্ন করিতেন ও করিয়া থাকেন। পতির স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাতে পূর্ণ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন কোন সময়ে রামচন্দ্র মাসে সহস্রাধিক মুদ্রাও উপার্জ্জন করিতেন। পাঠকগণ বোধ হয় তাহা হইতে অনুমাণ করিতে পারেন যে, রামচন্দ্র বিলক্ষণ বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন। কেন না, যিনি যতই ব্যয় বিষয়ে মুক্তহস্ত হউন না কেন, আপনার স্ত্রী পুত্রাদির জন্য কিছু সঞ্চিত না করিয়া, কেহ সৎকার্য্যে দুই পয়সা ব্যয় করিতে অগ্রসর হন না। রামচন্দ্র সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, ভক্তের অর্থ সাঁকোর জলের ন্যায় হওয়া উচিত। সাঁকোর জল কখন সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে না— একদিক্ হইতে আসে, অপর দিক্ দিয়া চলিয়া যায়। প্রকৃত ভক্তও কখন সঞ্চয় করেন না। তাঁহার উপার্জ্জনে অর্থ আসে, সৎকার্য্যে চলিয়া যায়। রামচন্দ্র প্রভুর উপদেশ জীবনের মহামন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বীরের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া অর্থরাশি গৃহে আনিতেন, কিন্তু হিসাবপত্র কিছুই না রাখিয়া মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় তাহাদিগকে বিদায় করিতেন। উল্লিখিত

প্রকার ভক্তসেবা ও দীন দুঃখিনীর অভাব মোচনই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। কত যে দরিদ্র সন্তানের স্কুলের বেতন প্রদান করিতেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাঁহার নিকট যাইয়া অর্থাভাবে লেখাপড়া হইতেছে না জানাইলে, তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িতেন। স্কুলের বেতন, পরীক্ষা দিবার জন্য অর্থ প্রভৃতি যে যাহা চাহিত, সে তাহাই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইত। অনেক বালককে তিনি আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদিগের নিকট বলিতেন, 'বাল্যকালে অর্থাভাবে আমি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারি নাই। সেই কারণে অর্থের জন্য কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না শুনিলে, আমার বড় কষ্ট হয়।"

এইরূপে প্রভু রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করিয়া ও ভক্তসেবায় রামচন্দ্রের দিনগুলি সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্রকে "কাপ্তেন" (অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠ) বলিতেন। কোন ভক্ত বাটীতে মহোৎসব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রামকৃষ্ণদেব রামের সহিত পরামর্শ করিতে বলিতেন। কাহারও অশিষ্টাচার দর্শন করিলে তিনি রামকে বলিতেন ও রামচন্দ্রও তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনাদি করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। মহোৎসবাদি কার্য্যে সকলের উপর কর্তৃত্বের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। তিনিও মহাতেজস্বী ও কর্ম্মনিপুণ ছিলেন, সুতরাং প্রভুর সেবা সম্বন্ধে কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি হইতে দিতেন না।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া রামচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল বটে, যদিও তাঁহার নিত্যই নূতন নূতন অলৌকিক আচরণ দেখিয়া তাহা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ হইতে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পান নাই। ভগবানের কৃপায় তাঁহার এ অভাবও মোচন হইয়া গেল। রামচন্দ্র সে সময়ে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যতই মহাপ্রভুর জীবনবৃত্তান্ত ও চরিত্রের বিষয় জ্ঞাত হইতে লাগিলেন, ততই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের বহু বিষয়ের সাদৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রামচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ ?" রামচন্দ্র কহিলেন, "আপনাকে দেখিতেছি।" তখন রামকৃষ্ণদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে দেখিয়া তোমার কি মনে হয় ?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনাকে আমার চৈতন্যদেব

মনে হয়।" তখন রামকৃষ্ণদেব, অন্য আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "বামণীও* ঐ কথা বলত বটে।" এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের পূর্ব্ব সংস্কার আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

প্রতি রবিবার ও আফিসের ছুটীর দিন দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভক্তের সমাগম হইত। অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু রামকৃষ্ণদেবের নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে যাইতেন। রামকৃষ্ণদেব এই সকল ভক্তগণকে তাঁহার মধুর ভাষায় উপদেশ প্রদান করিতেন। রামকৃষ্ণদেব যাহা যাহা বলিতেন, রামচন্দ্র তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইতেন। এইজন্য তিনি কাগজ ও পেন্‌সিল লইয়া বসিয়া থাকিতেন। তত্ত্ববিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্রের এইরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "রাম! তুমি অত করিতেছ কেন? এর পর দেখ,' তোমার মনই তোমার গুরু হবে— যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তাই ব'লে দেবে।" প্রভুর এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র নিরস্ত হইলেন। বাস্তবিক, এই আশীর্ব্বাদ পূর্ণ পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রামচন্দ্রের হৃদয় চিরদিনই দয়ায় গঠিত। তিনি আপনি প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াই যে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। অনেক বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে তিনি প্রভুর নিকটে লইয়া যাইতেন এবং আপনার দয়ার্দ্র হৃদয়ের গুণে তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যে কত লোক প্রভুর কৃপাভাজন হইয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তিনি আপনি অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল আপনি পরিতৃপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জগতের অপর সকলকেও সেই অমৃতকুণ্ডের সন্নিহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা তাঁহার মহত্ত্ব ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? এতদ্ব্যতীত, ঠাকুর আপনার লীলার প্রায় শেষ সময়ে রাম, মহেন্দ্র, প্রভৃতি পাঁচজনকে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

একদিন অপরাহ্ন সময়ে রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক ভক্ত তাঁহাকে দর্শন

* রামকৃষ্ণদেবের যখন লীলাচ্ছলে সাধন ভজন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া তাঁহাকে গুহ্য সাধন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-কন্যার চরিত্র অতিশয় অদ্ভুত। পাঠকগণ রামচন্দ্র প্রণীত রামকৃষ্ণদেবের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ইহার বিষয় কিছু কিছু অবগত হইতে পারেন।

করিতে যাইলে পর, তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি মাকে বলিতেছিলাম যে, আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে পারি না। রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয়, কেদার, এদের একটু শক্তি দে। এরা উপদেশ দিয়া প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।"

রামকৃষ্ণদেবের লীলাবস্থার সময় হইতেই রামচন্দ্র প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অনুমতি লইয়াই, তিনি সর্ব্বপ্রথমে কোন্নগরের হরি সভায় "সত্য ধর্ম্ম কি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের উপদেশ প্রচারের জন্য তিনি তত্ত্বসার নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। যে সময়ে এই পুস্তক মুদ্রিত হইতেছিল, সে সময়ে অনেক ভক্ত তাঁহার এ কার্য্যে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, এ বিষয় লইয়া তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের নিকট পর্য্যন্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন। তৎপরে রামকৃষ্ণদেব একদিন রামচন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা! এরা সব ব'লছিল, তুমি কি ছাপ্‌ছ? তাতে কি লিখেছ?" রামচন্দ্র কহিলেন, "আমি অন্য কিছু লিখি নাই। কেবল আপনি যে সকল উপদেশ ব'লে থাকেন, সেই সকল লিখেছি?" এই বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ওঃ! এই লিখেছ! তার আর কি? বেশ করেছ। দেখ যদি তুমি আপনি লিখেছ মনে ক'রে লেখ, তা হ'লে কেউ নেবে না। আর যদি তুমি মনে কর তিনি লেখাচ্ছেন, তা হ'লে দেখ' উজান বইবে। আর দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপ' না। আমার জীবনী বহির ক'ল্লে আমার শরীর থাকবে না?" রামচন্দ্র কহিলেন, "আমি জীবনী ছাপি নাই?" ঠাকুরের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে আরও বলের সঞ্চার হইল। তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "তত্ত্ব-সার" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আরও প্রভুর উপদেশ নিয়মিতরূপে আলোচনা ও প্রচার করিবার জন্য ঠাকুরের লীলাসম্বরণের কিছু পূর্ব্বে তিনি তত্ত্ব-মঞ্জরী নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুরের লীলাসম্বরণের পরও এই তত্ত্ব-মঞ্জরী কিছুকাল প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়িণী পত্রিকার বহুল প্রচার প্রয়োজন ও গ্রাহক সংখ্যা অধিক হয় না দেখিয়া তিনি তত্ত্ব-মঞ্জরী বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে গ্রেট ইডেন প্রেসের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু আপনার অন্তরের প্রীতির সহিত তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য

করিতেন। বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ-সেবকগণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের বিষয় প্রচার করিতে রামচন্দ্রই অগ্রণী। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ কিছু প্রচার করিতে সমর্থ বা ইচ্ছুক হন নাই।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার লীলাভিনয় সমাপ্ত করিবার জন্য পীড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে ভক্তেরা তাঁহাকে চিকিৎসিত করিবার জন্য কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। রামচন্দ্র একার্য্যে একজন প্রধান উদ্যোগী। প্রভুর আরোগ্যলাভের চিন্তায় যে তিনি কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার অসুস্থতায় প্রাণের নিদারুণ যাতনা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিতে পারিবে? রামচন্দ্র প্রভুর পরিচর্য্যার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার প্রাণের আশা পরিপূর্ণ হইল না। ঠাকুর তাঁহার ভক্তবৃন্দকে অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেবের লীলা সম্বরণ রামচন্দ্রের প্রাণে চিরদিনের জন্য শেলসম বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি প্রায়ই সকলের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "আমি ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর হইতে চিকিৎসা করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আর ত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলাম না!"

রামকৃষ্ণদেবের লীলাসম্বরণের পর, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার দেহাবশিষ্ট সমস্ত অস্থি তাম্রকলসে পূর্ণ করিয়া কাশীপুরের উদ্যানে* লইয়া রাখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের লীলাসম্বরণের পর তাঁহার অস্থিপঞ্জ সমাহিত করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য অনেকেই অনেক ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছিলেন। কেহ ভূমি দান করিয়া, কেহ পর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গীকার কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপুঞ্জ লইয়া তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে নানাবিধ মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হয়, ইহা অনেকের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভূমি ক্রয় করিবার অর্থ কোথায়?

এদিকে প্রভুর অস্থি অনাবৃত অবস্থায় বহুদিন রাখা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন,

---

* রামকৃষ্ণদেবের অসুস্থতার শেষ সময়ে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কাশীপুরে একটী উদ্যান ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল।

যদ্যপি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কাঁকুড়গাছীর উদ্যানে প্রভুর সমাধি প্রদান করা হউক। নানাবিধ বাক্‌বিতণ্ডার পর সকল রামকৃষ্ণভক্ত তাহাতেই সম্মত হইলেন। ১২৯৩ সালের জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে প্রতিপদ তিথিতে প্রভু লীলা-রূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিন রাত্রে প্রভুর অস্থি-পূর্ণ কলস রামচন্দ্রের বাটীতে আনীত হইল। রামচন্দ্র আপনার বাস-গৃহে তাহা স্থাপিত করিয়া গন্ধ মাল্যে সুসজ্জিত করিলেন। পরদিন সকল ভক্ত সমবেত হইলে, সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহা রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছীর উদ্যানে* আনীত হইল। শশী, (এক্ষণে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে অভিহিত) নরেন্দ্র, (এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া পরিচিত), প্রভৃতি তরুণ বয়স্ক ভক্তগণ ও কোন কোন বয়ঃপ্রাপ্ত গৃহী ভক্তে মস্তকে করিয়া প্রভুর শরীরাবশিষ্ট অস্থিপূর্ণ কলস আনিয়াছিলেন। পরে তাহা সমাহিত করিয়া মহোৎসবাদি করা হয়।

প্রভুর সমাধি প্রদান করিয়া সকলেই শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে প্রভুর আরতি করিয়া ভোগ প্রদান করিতে হইবে, এ কথা কাহারও স্মরণ ছিল না। নৃত্যগোপাল নামক জনৈক ভক্ত উদ্যোগ

* সংকীর্ত্তনাদি করিবার জন্য একটী উদ্যান ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইলে, রামচন্দ্র প্রভুর নিকট অনুমতি লইতে যাইয়াছিলেন। প্রভু তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "এমন স্থানে বাগান কিনিও, যেখানে একশ'টা খুন হইলেও টের পাওয়া যায় না।" রামচন্দ্র অন্বেষণ করিয়া উপরি-উক্ত উদ্যান (যাহা সকলের নিকট এক্ষণে যোগোদ্যান বলিয়া পরিচিত) ক্রয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই উদ্যানে আসিবার পথ ইত্যাদি অতিশয় কদর্য্য এবং ইহা নিবিড় জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত ছিল। উদ্যান ক্রয় হইবার পর প্রভু একদিন তাহা দেখিবার জন্য আসিতে চাহিয়াছিলেন। রামচন্দ্র প্রভু আসিবার দিনের পূর্ব্বে উদ্যানের একটী স্থান (যে স্থানে এক্ষণে প্রভুর সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তথায় চতুর্দ্দিকে তুলসীকানন রচিত করিয়া মধ্যে একটী বৃহৎ তুলসী বৃক্ষ রোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া এই তুলসীবৃক্ষের নিকট প্রণাম করেন। পরে উদ্যানের একটী বৃক্ষের দুইটী আম্র ও কলিকাতা হইতে আনীত কিছু ভোজ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পুষ্করিণীর জল পান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছায়, ঠিক যে স্থানে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুর যে বৃক্ষের আম্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাকে "রামকৃষ্ণভোগ" এবং যে পুষ্করিণীতে জল পান করিয়াছিলেন, তাহাকে "রামকৃষ্ণকুণ্ড" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রভুর আদেশ অনুসারে তাঁহারই নির্দ্দেশিত স্থলে একটী সাধন ভজন করিবার জন্য পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

করিয়া আরতি ইত্যাদি করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই যোগোদ্যানে প্রভুর নিত্য সেবা চলিয়া আসিতেছে।

যদিও জন্মাষ্টমীর দিন প্রভুর দেহাস্থি সমাহিত করা হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে যে সকল ভক্তেরা গঙ্গার তীরে সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মঠ নির্ম্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা সমাহিত অস্থি উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভুর মহা পবিত্র অস্থিপুঞ্জ একবার সমাহিত করিয়া স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া রামচন্দ্র আপত্তি করিলেন। ইহাতে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ দুই মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। কেহ পূর্ব্বোক্ত ভক্ত-বৃন্দের সহিত সহানুভূতি, কেহ বা রামচন্দ্রের মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কে এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে, এবং কাহার কথাই বা সকলে শুনিবে? সুতরাং অন্য উপায় না থাকাতে, রামচন্দ্রের বাটীতে সমস্ত রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের একটী সভা আহূত হইল। সেই সভায় নানাবিধ যুক্তি তর্কের পরে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রভুর সমাহিত অস্থি কস্মিন্‌কালে স্থানান্তরিত হইতে পারে না এবং রামকৃষ্ণভক্তের মধ্যে কেহ তাহা কথন করিবে না। সভা আহ্বানের ফলে উপরোক্ত যাহা মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা একখণ্ড কাগজে সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

প্রভুর সমাধি প্রদত্ত হইলে পর, তাঁহার নিত্য সেবা নির্ব্বাহের জন্য সকলে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন, স্বীকার করিলেন। কেহ কেহ কিছু দিন সাহায্য করিলেন। পরিশেষে যিনি যাহা কিছু ঠাকুরের সেবার জন্য প্রদান করিতেন, তাহা বন্ধ করিলেন। রামচন্দ্র চিরদিন বীরভক্ত। বীরের ন্যায় প্রভুর সেবার ও সাম্বৎসরিক লীলাসম্বরণোৎসবের ব্যয়-ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। একজন বেতনভোগী ব্রাহ্মণই প্রায় ঠাকুরের সেবা করিত। রামচন্দ্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া ও ছুটীর দিন প্রায় সমস্ত দিন থাকিয়া, প্রভুর সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইতেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে ঠাকুরের সেবা সম্পন্ন হইলেও, তাহাতে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রামচন্দ্রের অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা প্রায়ই নানা প্রকার অনাচার ও সেবায় অমনোযোগ প্রদর্শন করিতেন। তিনি তিরস্কারাদি করিয়াও তাহাদিগের ব্যবহার সংশোধন করিতে পারিতেন না। প্রভুর সেবায় ত্রুটি রামচন্দ্রের প্রাণে দারুণ ক্লেশকর

... উঠিল। সেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া, তিনি আবাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার কন্যাগণকে লইয়া বাটীতে রহিলেন। রামচন্দ্র যোগোদ্যান হইতেই কলিকাতায় কর্ম্মস্থানে গমন করিতেন এবং বৈকালে প্রায়ই একবার বাটীর সংবাদ লইয়া যোগোদ্যানে প্রত্যাগত হইতেন। প্রভুর পূজা, আরতি ইত্যাদি কার্য্য অধিকাংশ সময়ে তিনি আপনিই করিতেন। প্রভুর সেবার জন্য আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি কাঁকুড়গাছীতে বাস করা অল্প অনুরাগের কথা নহে! আপনার অর্থ সামর্থ ও পারিবারিক সুখ সত্ত্বেও যিনি ভগবানের জন্য এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহাকে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি ধন্য ধন্য না বলিয়া থাকিতে পারেন?

প্রভুর লীলাসম্বরণের পর রামচন্দ্র তাঁহার একখানি জীবন-বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন ভজনের বিষয় যাহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন ও তাঁহার পর-জীবনের ঘটনাবলী যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই এই জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জীবন-বৃত্তান্তের পর প্রভুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তত্ত্ব-প্রকাশিকা নামক পুস্তক খণ্ডাকারে বাহির করিয়াছিলেন। যখন যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করিলেন, সেই সময়ে তত্ত্ব-প্রকাশিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু সংখ্যক উপদেশ ও তাহার সংখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র যে সময়ে যোগোদ্যানে আসেন, সেই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন যুবক রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ইত্যাদি পাঠ করিয়া তাঁহার বিষয় আরও অবগত হইবার জন্য এবং জ্ঞানলাভের প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট সচরাচর যাতায়াত করিত। তিনি যোগোদ্যানে আসিলে, তাহারাও মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ ও ঠাকুরের সেবা কার্য্যের সহায়তা করিত। ক্রমে এই যুবকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের মধ্যে অবিবাহিত জনকয়েক আবার আপন আপন গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবা করিবার জন্য যোগোদ্যানে রামচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র যুবকগণের যৌবনোচিত উৎসাহ ও উদ্যম এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তির ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগের ইহ পারত্রিক উন্নতিকল্পে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারাও তাঁহাকে এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন সংসারের একমাত্র পথপ্রদর্শক গুরুজ্ঞানে তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন। রামচন্দ্র সৎকার্য্যে মুক্তহস্ত। যুবকবৃন্দের ধর্ম্মে মতি গতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া প্রায়ই সমারোহের সহিত মহোৎসবাদি করিতে লাগিলেন। প্রতি রবিবার এবং ছুটীর দিনে অনেক নূতন নূতন তত্ত্বজ্ঞান-প্রত্যাশী ভক্ত আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সমস্ত দিন তাঁহাদের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় আলোচনা ও সংকীর্ত্তনাদি করিয়া আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতেন। এতদ্ব্যতীত মহোৎসবাদি হইলে ভক্তগণের আত্মীয় স্বজনদিগকেও নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারাও আসিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও রামকৃষ্ণদেবের বিষয় আলোচনা করিয়া আপনাদের হৃদয়ের পবিত্র ভাবের বৃদ্ধি করিতেন। এইরূপে রামচন্দ্র এক প্রকার নীরবেই রামকৃষ্ণ-প্রচার-কার্য্য সাধিত করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামচন্দ্র বহুবাজারস্থ ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানমন্দিরে বিজ্ঞানের বক্তৃতা প্রদান করিতেন। ১২৯৯ সালের শেষ ভাগে তিনি বিজ্ঞানমন্দিরের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞানের বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি, মোক্ষলাভ সম্বন্ধে সহায়তা হইতে পারে, তাহাই তিনি এই সকল বক্তৃতায় সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। বক্তৃতাগুলি অনেকেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এক দিকে বিজ্ঞানের নয়নানন্দকর পরীক্ষা, অপর দিকে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশপূর্ণ নীতি ও ধর্ম্মের কথা শ্রোতৃবর্গের বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষণ করিত। এইরূপে বিজ্ঞানের আবরণে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। যে দিন তিনি এইরূপ বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করেন, সেই দিন তিনি সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "যে বিজ্ঞানের দ্বারা এতদিন ধরিয়া আমি আমার সামান্য শক্তি অনুসারে ঈশ্বর-তত্ত্বের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সেই বিজ্ঞানই একদিন আমার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়া আমাকে নাস্তিক করিয়াছিল। আপনারা, বোধ হয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আমার এই অভিনব বিজ্ঞান-চক্ষু খুলিয়াছে।"

রামচন্দ্র এই সময়ে প্রতি রবিবারের প্রাতঃকালে উপরোক্ত যুবক শিষ্যবৃন্দকে যোগোদ্যান হইতে কলিকাতার পথে পথে রামকৃষ্ণ নাম গান করিতে

পাঠাইতেন। একদিন তাহারা অতি প্রত্যূষে এইরূপ রামকৃষ্ণ গুণগান করিতে করিতে কলিকাতাভিমুখে যাইবার জন্য প্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে প্রণামাদি করিতেছে, এমন সময়ে রামচন্দ্র সহসা আপনার গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জনৈক যুবককে ডাকিয়া কহিলেন, "গিরিশ দাদাকে (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) বলিও যে, গুডফ্রাইডের দিন আমি 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না?' সম্বন্ধে মিনার্ভা থিয়েটারে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা করি।" শিষ্যবৃন্দ তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। গিরিশ বাবুও প্রথমে কোন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। রামচন্দ্র পূর্ব্ব-কথিত বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতার শেষ দিনে শ্রোতৃবর্গকে মিনার্ভা থিয়েটারে রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব বিচার সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে বক্তৃতা হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ পত্রাদিও মুদ্রিত হইল। কিন্তু রামকৃষ্ণভক্তগণের ভিতরে নানাবিধ আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহই মনে করেন নাই যে, কোন ভক্ত রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব এত শীঘ্র সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতে সাহসী হইবেন। যদিও অনেকেরই তাঁহাকে অবতার বলিয়া ধারণা ছিল, তথাপি তাঁহারা তাহা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। লোক-লজ্জা, লোকের ভয়, অনেককেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। যাঁহাদের এরূপ লজ্জা বা ভয় ছিল না, তাঁহারা, বোধ হয়, আপনাদের পরিতৃপ্তিতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। আপনারা সুধাভাণ্ডের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অপরকে তাহা জানাইবেন কেন? কিন্তু রামচন্দ্র এরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা সত্য, তাহার জন্য লজ্জা, ঘৃণা, ভয় চরণতলে দলিত করিতে তিনি সততই প্রস্তুত ছিলেন। উচ্চকণ্ঠে সত্য ঘোষণা করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। আর আপনার উদার হৃদয়ের গুণে কেবল আপনার সুখেই সুখী ছিলেন না। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের করুণামৃতের আস্বাদন পাইয়াছিলেন বলিয়া সকলকেই তাহা প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ভক্তগণের অনেকেই রামচন্দ্রের এই বক্তৃতা দিবার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা পূর্ব্বে সম্মত হইলেও, এইরূপ জনকয়েক ভক্তের আপত্তি শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্রকে তাঁহাদের থিয়েটারে বক্তৃতা দিতে দিবেন না বলিয়া জানাইলেন। রামচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা সোৎসাহে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চ

প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে ১৯শে চৈত্র (১২৯৯ সাল) শুক্রবার আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার সর্ব্বস্থানেই প্রচার হইয়াছিল, বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য, তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। এরূপ নূতন বিষয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়াছিলেন। বেলা ৮টা বক্তৃতার সময় স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ৮টার বহুপূর্ব্ব হইতেই রঙ্গালয় লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকেই স্থানাভাবে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র ও রাম-কৃষ্ণ-চরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী প্রভুর নাম গান করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সহসা যেন সকলের হৃদয়ে একটা মহাশক্তির প্রবাহ চলিয়া গেল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয়, রামচন্দ্র নূতন কথা বলিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া হাস্যাস্পদ হইবেন; এমন কি, হয়ত শোতৃমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশঙ্কা অনুযায়ী কোন কার্য্যই হইল না। রামচন্দ্র শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করাইয়া রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রমাণিত করিলেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত কথাই স্থিরভাবে শ্রবণ করিলেন। কিন্তু যখন সেবকমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতার ভাবানুযায়ী গাহিতে লাগিলেন,

তব দরশনে নাথ খুলিল জ্ঞান নয়ন।
জাগে মনে ছিল যত আঁধার আবরণ॥
সাধন ভজন করি, নাহি হেন শক্তি ধরি,
রামকৃষ্ণ নাম স্মরি, সুখে যাপি নিশিদিন ;—
মধুর নামের গুণে, শান্তি সদা প্রাণে প্রাণে,
বিলাতে তাই জনে জনে, দীন আকিঞ্চন॥

তখন যেন সকলের অন্তর দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় কি একটা প্রবাহিত হইতে লাগিল! সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন উৎফুল্ল। রামচন্দ্র বৈজ্ঞানিক মীমাংসা ও পরে আপনার জীবনের প্রত্যক্ষ মীমাংসা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন, সমস্তই সত্য ও তাঁহার প্রাণের ভাবের সহিত পরিব্যক্ত। সুতরাং তাহা শোতৃ-বর্গের হৃদয়ে যাইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, রামকৃষ্ণ অনাথের নাথ, রামকৃষ্ণ

অগতির গতি, রামকৃষ্ণ মূর্খের দেবতা, রামকৃষ্ণ পতিতের অবতার। যাহারা আমাদের মত নিরুপায়, যাহারা সংসার-চক্রে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, যাহাদের দশদিক্ শূন্যময় বোধ হইয়াছে, তাহাদেরই জন্য—কেবল তাহাদেরই জন্য—রামকৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন। তিনি একদিন ভাবাবেশে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, সকলে শ্রবণ করুন, 'যে কেহ ভগবান্‌কে জানিবার জন্য, ভগবান্‌কে পাইবার নিমিত্ত, আমার কাছে আসিবে, তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইবে'।"

যখন বক্তৃতার পরিসমাপ্তি হইল, তখন প্রায় সমস্ত শ্রোতাই পরিতুষ্টি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তপ্রবীর রামচন্দ্রের কথাগুলি তাঁহাদের প্রাণের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।

রামচন্দ্র কেবল একটী বক্তৃতা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। প্রভুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া প্রতি মাসে এক একটী বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুলির পরিচয় সংক্ষেপে আর পাঠকগণকে কি করিয়া প্রদান করিব? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকের জীবনে এক একটা মহান্ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। অনেকেরই তাহা দ্বারা হৃদয়ের সংশয়রাশি বিদূরিত হইয়াছে। অনেকেরই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। অনেকেই এই অকূল সংসার-সাগরে কূল পাইয়াছেন। আর বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সহস্র সহস্র গৃহ অমূল্য রত্নরূপে আলোকিত করিতেছে। রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য এইরূপে তিনি সর্ব্ব প্রথমে সাধিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, প্রভু রামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র যে সময়ে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীরে অসুস্থতার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মধুমেহ (Diabetes) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রোগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। নিতান্ত শয্যাশায়ী না হইলে, অসুস্থ শরীরের উপরই তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত বক্তৃতা দিবার কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী

ব্রণ (Carbuncle) বহির্গত হইয়া তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত করিয়াছিল। আর একবার রক্ত আমাশয় রোগেও তাঁহাকে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা, পূর্ব্ব-কথিত মধুমেহ রোগ পরিপাক পাইয়া অ্যালবিমিনিউরিয়া রোগে পরিণত হইয়া দিন দিন তাঁহার শরীরের ক্ষয়-বিধান করিতেছিল। যে সময় তিনি "জমা খরচ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে মনস্থ করেন, সে সময়ে সহসা তাঁহার উরুদেশে এক প্রকার বেদনার সঞ্চার হয়। রামচন্দ্র প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, এ বেদনা উপেক্ষা করিয়া অথবা ইহা হইতে শীঘ্র পরিমুক্তি লাভ করিয়া বক্তৃতা দিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা গুরুতর ভাব ধারণ করিল। বেদনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এতদূর ক্লেশকর হইয়া উঠিল যে, তিনি দিবারাত্রে এক-বারও নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। আট দশ দিন এইরূপ অনিদ্রায় অতি-বাহিত হইলে, তিনি যন্ত্রণায় উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এই অসুস্থতায় প্রথমাবস্থায় তিনি ডাঃ মেকোনেল সাহেবের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। কিন্তু সহসা মেকোনেল সাহেবেরও মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহাকে অনেক বিচক্ষণ বাঙ্গালী ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ঔষধে কিছুতেই উপকার হইল না। রামকৃষ্ণভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেকেই তাঁহার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কবিভূষণ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন মহাশয় তাঁহাকে একদিনেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করেন এবং তদ্দ্বারা রামকৃষ্ণসেবকগণের নিকট ধন্বন্তরীর ন্যায় তাঁহার যশোরাশি বিশিষ্টরূপে বিস্তারিত হইয়াছে।

শরীর অসুস্থ হইলেও, রামচন্দ্র বক্তৃতাটী প্রবন্ধাকারে লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। আরোগ্য হইয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিবেন, এই সম্ভাবনায় চারিদিকে বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন উক্ত প্রকারে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল, তখন রামচন্দ্র বক্তৃতা প্রদান করিবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাঁহার জনৈক পদাশ্রিত দাসকে ডাকিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার দ্বারাই বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল।

"জমা খরচ" বক্তৃতা প্রদানের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই রামচন্দ্র, শরীরের নিত্য নিত্য অসুস্থতা নিবন্ধন, প্রতি মাসে বক্তৃতা দিতে সমর্থ হইতেন না। যদিও নিশি বাবুর চিকিৎসায় আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্তু অ্যালবিমিনিউ-

রিয়া রোগের জন্য দুর্ব্বলতায় তাঁহার শরীর দিন দিন ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুদিন পরে প্রভুর প্রচার কার্য্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় বলবতী হইয়া উঠিল। শরীরের উপর তিনি দৃষ্টি করিলেন না। রুগ্ন শরীরেই আবার প্রতি মাসেই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শাস্ত্রাদি, জাতিবিচার, বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের শরীর অসুস্থ হইলেও, কেবল মানসিক বলেই কার্য্য করিতেন। যে সময়ে উপরোক্ত শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি তত্ত্ব-মঞ্জরীর পুনঃ প্রচার আরম্ভ করেন।

আফিসের কর্ম্ম ও অপর দুই স্থানে বিজ্ঞানের বক্তৃতা প্রদান, একখানি মাসিক পত্রিকা অনন্যসহায় হইয়া পরিচালন ও প্রতি মাসে একটী একটী গভীর চিন্তাপ্রসূত বক্তৃতা প্রদান ও তাহার প্রবন্ধ রচনা, অসাধ্য অ্যালবিমিনিউরিয়া প্রভৃতি বহুবিধ রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু রামচন্দ্রকে আমরা এই সকল কার্য্য অবহেলায় নিষ্পন্ন করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাঠক! তুমি তোমার জীবনে এইরূপ কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তি আর প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? এরূপ ধর্ম্মের জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত মহাজনের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছ কি?

এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া রামচন্দ্রের শরীর একেবারে ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। শরীর তাহার আপনার ধর্ম্ম অনুসারে পরিচালিত হইবেই হইবে। ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে এরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরও ক্রমে অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল। এই রুগ্ন শরীরের উপরে তাঁহার একটু মানসিক ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া, বোধ হয়, আরও তাঁহার শরীরকে কালগ্রাসের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কতকগুলি যুবক গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট যোগোদ্যানে বাস করিত। রামচন্দ্র আপনার পুত্রের ন্যায় ইহাদিগের সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতির জন্য সততই সচেষ্ট থাকিতেন। সদুপদেশ দান করিয়া, উচ্চ বিদ্যায় শিক্ষিত করাইয়া, এমন কি, কাহার কাহার বা আশাতীত অর্থ উপার্জ্জনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাহাদিগের জীবনে ধর্ম্মের বিমল ভাব সঞ্চার করিয়া দিয়া

তাহাদিগকে জনসমাজের উজ্জ্বল রত্নবিশেষে পরিণত করিবার সাধ তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর নিহিত ছিল। এইরূপে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে কঠোর নিয়মে পরিচালিত করিতেন। কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিবে? উক্ত যুবকবৃন্দের অনেকে তাঁহার সহিত দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী অপ্রীতিকর জ্ঞান করিয়া, তাঁহার সুশাসন হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল এবং যৌবনসুলভ আকাঙ্ক্ষাপীড়নে আপাত-সুখকর জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই মনঃক্লেশে বোধ হয় তাঁহার আরও অধিক স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল। যাহা হউক, কিছুদিন পরে ভীষকগণের প্রতিবন্ধকে ও শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি প্রতি মাসে যে ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা প্রদান করিতেন, তাহা আর দিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল তত্ত্ব-মঞ্জরীর দ্বারাই প্রভুর প্রচার কার্য্য সাধিত করিতে লাগিলেন।

যদিও প্রতি মাসে মাসে বক্তৃতা প্রদান বন্ধ রহিল বটে, কিন্তু প্রায় রবিবারে যোগোদ্যানে ভক্তগণ সমবেত হইলেই, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের সহিত সংকীর্ত্তন ও তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিতেন। ইহাতেও তিনি শরীরের অসুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। সাধারণ নরনারীরা, হয়ত, তিনি শরীরের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে দোষী করিবেন এবং আমরাও হয়ত সেই আদর্শ লইয়া আলোচনা করিতেছি বলিয়া, তাঁহাদিগের বিরাগ-ভাজন হইব, কিন্তু কি করিব, যাহা সত্য, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। আরও জগতের ইতিহাসে অনেক সাধু মহাত্মা ও ভক্তের জীবনেও এইরূপ ঘটনা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই মহাপুরুষগণের দৃষ্টি চৈতন্যের প্রতিই অধিক। জড়' দেহ তাহা অতি অল্প পরিমাণেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে একবার আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া চিদানন্দের আস্বাদ পাইয়াছে, যে একবার প্রেমময়ের মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুলকার্ণবে ভাসিয়াছে, সে যে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আপনাকে ভুলিয়া যাইবে, তাহার মন যে নশ্বর জড় শরীরের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিতে কুণ্ঠিত হইয়া হৃদয়েশ্বরের দিকে প্রধাবিত হইতে চাহিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা বিষয়াসক্ত; শরীরের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতিই আমাদিগের একমাত্র দৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, সুতরাং আমরা তাঁহার সে ভাব কি প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইব? যাহা হউক, এইরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় প্রচার ও তাঁহার সেবা করিতে করিতে রামচন্দ্রের জীবনের আরও দেড় বৎসর কাল অতি-

বাহিত হইয়া গেল। তাঁহার শরীর যদিও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও দিন দিন তাহাতে রোগের উপর উপসর্গের পর উপসর্গের উৎপত্তি হইতেছিল, তথাপি কেহই তখনও ভাবে নাই যে, ধর্ম্মগগনের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শীঘ্রই চিরদিনের জন্য অস্তে চলিয়া যাইবে ও তাঁহার অভাবে অনেক ধর্ম্মপথের পান্থ গাঢ় অন্ধকারে আলোকরেখা না দেখিয়া দিশেহারা হইয়া ভ্রমণ করিবে।

দেখিতে দেখিতে ১৩০৫ সালের কাল হেমন্ত ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রের শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে এতদূর রক্তাল্পতা হইয়াছিল যে, সর্ব্বশরীরের বর্ণের গাঢ়তা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কেবল মুখমণ্ডল অত্যধিক চিন্তার জন্য কৃষ্ণাভ। অ্যাল-বিমিনিউরিয়ার জন্য পাদদেশে শোথের সঞ্চার হইয়াছিল। রামচন্দ্র বলিতেন যে, তাঁহার হৃদপিণ্ডের কোন স্থানে দোষ হইয়াছে। বাটীর সিঁড়িতে উঠিতে তাঁহার শ্বাসক্লেশ হইত। নিশিবাবু চিকিৎসা করিতেছিলেন। কার্ত্তিকপূজার দুই একদিন পরেই একদিন রাত্রে রামচন্দ্র যোগোদ্যানে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইল। রাম-চন্দ্রের পিতামহের হাঁপানী রোগ ছিল। পিতামহের অনেক সদ্গুণের সহিত এই হাঁপানী রোগটীও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে হাঁপানীর জন্য তাঁহাকে ক্লেশও পাইতে হইত, কিন্তু তাহা ডাক্তারী ঔষধে প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যাইত। গভীর রাত্রে সহসা হাঁপানীর আক্রমণে তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি তাঁহার জনৈক সেবককে ডাকিয়া ঔষধ প্রদান করিতে বলিলেন। আইওডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ হাঁপানীর এক অমোঘ ঔষধ। রামচন্দ্রের আদেশানুসারে সে তাহাই প্রদান করিল, কিন্তু কোনই উপকার হইল না। রামচন্দ্র এক মাত্রা, দুই মাত্রা, ক্রমে প্রায় চারি মাত্রা (৭০ গ্রেণ) উপর্য্যুপরি সেবন করিলেন, কিন্তু এই ঔষধরাশি কোথায় যেন ভাসিয়া যাইল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার পক্ষে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া দারুণ ক্লেশকর হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহার আর একজন হতভাগ্য সেবককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তখন চতুর্দ্দিকে বাতায়ন উন্মুক্ত করাইয়া দিয়া, উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া, ক্লেশে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগি-লেন। তাঁহার শ্বাসক্লেশ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য দুই একটী ভক্ত যাঁহারা যোগোদ্যানে বাস করিতেন, তাঁহারা বীজন করিতে লাগি-

লেন। তথাপি রামচন্দ্র ক্রমে রুদ্ধশ্বাসের ন্যায় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আকাশ যেন তাঁহার নিকট বায়ুশূন্য বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার সমস্ত শরীরে কম্প উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে দুইজন হত-ভাগ্যের কণ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া, অর্দ্ধ শয়ন ও অর্দ্ধ উপবেশনের ভাবে তিনি এইরূপ নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন, তাহারা তরুণ বয়স্ক ও ক্ষীণ বুদ্ধি। এই ভীষণ বিপদে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যদিও কলিকাতার ডাক্তার ও আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দিবার জন্য লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তথাপি এক ঘণ্টার কমে কাহারও কলিকাতা হইতে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদিগের ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে লাগিল। বিজন বনস্থলী ভেদ করিয়া প্রভুর শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে রামকৃষ্ণধ্বনি উঠিতে লাগিল। আপনাদিগের জীবনমরণের একমাত্র সহায় রামচন্দ্রের জন্য, হতভাগ্যেরা প্রাণপণে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল। অসহায় উপায়হীন ব্যক্তির রোদন ব্যতীত আর কি বল আছে? কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঙ্গালদিগের কথায় একবার কর্ণপাত করিলেন। রামচন্দ্রের সংজ্ঞার সঞ্চার হইল। যদিও তৎপরেও পুনরায় দুই তিনবার পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল বটে, কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। পরে ডাক্তার ও কবিরাজের চিকিৎসার কিছু দিনের পর তিনি এক প্রকার আরোগ্যলাভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই আরোগ্যলাভ অতি অল্পদিনের জন্যই হইয়াছিল। তাঁহার জীবাত্মা দেহপিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া প্রভুর নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সুতরাং এই পাপকলুষিত পৃথিবীর পাপাচরণের মধ্যে বহুদিন থাকিতে চাহিবে কেন? যে দুই একদিন রহিল, সে কেবল জগতের জীবের প্রতি করুণাময়ের কিঞ্চিৎ করুণার জন্য ও ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে। রামচন্দ্র আরোগ্য লাভ করিয়াই পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। দুই চারি দিন কর্ম্ম করিতে করিতেই তিনি শরীরে দারুণ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন মেডিকেল কলেজের কর্ম্ম করিয়া অপরাহ্ণে তাঁহার সিমুলিয়ার বাটীতে আসিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক সন্ন্যাসী ভক্ত তাঁহার শরীর অসুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে সেইদিন বাটীতে

থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র আপনার শরীরে নানাপ্রকার ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন, সুতরাং সেই ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সেই-দিন গভীর রাত্রিতে পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় হাপানি নিদারুণ শ্বাস-ক্লেশ উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি নিরতিশয় যাতনা প্রদান করিয়া প্রাতঃ-কালে যদিও তাহা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার পাদদেশ হইতে উদর অবধি শরীরের নিম্নভাগ শোথে ফুলিয়া উঠিল ও নানাবিধ উপসর্গের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র এইরূপে দেড় মাস কাল রুগ্ন শয্যায় নিবদ্ধ হইয়া রহিলেন। যন্ত্রণার পরিসীমা নাই। আহার ও নিদ্রায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। যাহা কিন্তু আহার করিতেন, তাহা বমন হইয়া যাইত। আদৌ শয়ন করিতে পারিতেন না। শয়ন করিলেই শ্বাস রুদ্ধপ্রায় বলিয়া বোধ হইত। প্রতি রাত্রিতে যে কি ক্লেশ সহ্য করিতেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। গভীর রাত্রি; পল্লীর সকলেই নিদ্রার সুখশান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অভিভূত হইয়াছে; কিন্তু রামচন্দ্র জাগরিত! পার্শ্বে দুই একটী সেবক ছল ছল নেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। রামচন্দ্র একবার শয়ন করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। পুনরায় সেবকগণকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে "জয় প্রভু" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা ঔষধের উপর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভক্তেরা আশা পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, ভিষক্‌কুলের বিদ্যাবুদ্ধি যাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তিনি আরোগ্য করিয়া দিবেন। তিনিই রোগের জন্ম-দান করিয়াছেন, তিনিই আরোগ্যের বিধান করিবেন। ঠাকুর কি এমনই নিঠুর হইবেন যে, মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? কিন্তু হায়! তাঁহাদের আশা আশাই রহিয়া গেল, আর তাহা কখন পূর্ণ হইল না। তাঁহারা ভালবাসার বশে যাহা প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ তাহা, কি জানি, কি বুঝিয়া প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

এইরূপে প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হইলে, একদিন কোন বন্ধু ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বাটী পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। সিমুলিয়ার বাটীতে বিশেষ-রূপে রৌদ্র প্রবেশ করে না বলিয়া, তিনি অন্যত্র থাকিতে পরামর্শ দিলেন।

রামচন্দ্র তাহাতে অস্বীকার পাইলেন না। তাঁহার জনৈক জামাতা ও একজন সেবক বাটী অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে যোগোদ্যান হইতে তাঁহার আর একজন হতভাগ্য পদাশ্রিত দাস তাঁহার জন্য প্রভুর মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র প্রতিদিন একটু প্রসাদ মুখে দিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতেন। প্রসাদ গ্রহণের পর উক্ত হতভাগ্যকে তিনি বাটী পরিবর্ত্তনের কথা বলিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, বাটী ভাড়া করিয়া কি হইবে? আমায় বাগানে (অর্থাৎ যোগোদ্যানে) লইয়া চল। তোমরা ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া যথেষ্ট করিলে, কিছুই ত করিতে পারিলে না। এক্ষণে আমায় ঠাকুরের কাছে যাইতে দাও। আমি সেখানে যাইয়া তাঁহার চরণামৃত ও প্রসাদ খাইয়া সকল যন্ত্রণা হইতে জুড়াইব।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। সে স্থান ভাল নয়; সেখানে ডাক্তার কবিরাজ কেহই যাইতে চাহে না; সে বিজন বনে কি অসুখ হইলে যায়, ইত্যাদি তাঁহারা নানা কথা বলিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার ব্যক্তিই নহেন। তাঁহার প্রাণ প্রভুর নিকটে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল, আর কি কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারে? আত্মীয়গণের সহিত একটু বচসা হইবার পর, তিনি বাগানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র যোগোদ্যানে যাইবার জন্য এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামচন্দ্র অসুস্থতায় এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আপনি প্যার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। মানসিক বলে, অভাবনীয় বিক্রমে, সহসা তাঁহাকে দাঁড়াইয়া উঠিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তৎপরে, তাঁহাকে পাল্কীতে আনা হইল। তিনি উল্লিখিত হতভাগ্যকে সঙ্গে লইয়া, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ-মমতা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পুণ্যভূমি যোগোদ্যানে প্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পাঠক! সাধারণ মনুষ্যেরা অসুস্থতায় পড়িলে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার ও আত্মীয়বর্গের সেবা ও যত্নের জন্য লালায়িত হয়, ইহা তুমি প্রতিদিন দেখিতে পাও, কিন্তু যাঁহার শরীর এতদূর রুগ্ন যে, প্রতিক্ষণেই তাঁহার লোকান্তর হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার এইরূপ অচিন্তনীয় আচরণ কখন দেখিয়াছ কি? রামচন্দ্রের এই ব্যবহার দেখিয়া সকল ভক্তিবান পুরুষই যে মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে যোগোদ্যানে চলিলেন। পথিমধ্যে উক্ত হতভাগ্যকে কহিলেন, "বাঁচা গেল।" সে বলিল, হ্যাঁ, এতদিনের পর আপনার শনি ছাড়িল। রামচন্দ্র বলিলেন, "ঠিক্ বলিছিস্।" হতভাগ্য মনে মনে কত আশা করিয়াছিল যে, ঠাকুরের নিকটে যাইলেই আগার অসুখ ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু হায়! সে তখন বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র—তাহা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়া তাহাকে চিরদিন তুষানলে দগ্ধীভূত করিবে! রামচন্দ্র যোগোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার আদেশমত তাঁহাকে প্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি তথায় প্রণাম করিলেন ও মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তখন প্রায় বেলা ৩টা। মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দর্শন করাইবার কথা বলিলে, তিনি, প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের সময় হয় নাই, বলিয়া নিষেধ করিলেন। তখন তিনি মনের আনন্দের জন্য পাল্কীতে করিয়া আসিবার বা অন্য কোন কষ্টই অনুভব করিলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা আগত হইল। রোগেরও প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি আসিল। রামচন্দ্রের শরীরে প্রতিদিনের ন্যায় যন্ত্রণার আবির্ভাব হইল। যে দুইজন সেবক সততই তাঁহার নিকট থাকিত, তিনি তাহাদের ডাকিয়া প্রভুর গুণগান করিতে বলিলেন। তাহারা তাহাদের একমাত্র আশাস্থল প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সকাতরে রামকৃষ্ণ-সংগীত গাহিতে লাগিল। রামচন্দ্র জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া স্থির ভাবে প্রভুর নামামৃত পান করিতে লাগিলেন। নিশীথের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, রামকৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ, প্রভুর ধ্যানে মহানিমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিলেন। আবার কিছুকাল পরে তাঁহার অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণা হইতে লাগিল ও সেবকেরা রামকৃষ্ণ নাম গান করিতে লাগিল। এইরূপে নিশা অবসান হইয়া যাইল।

প্রতি রাত্রি এইরূপ ভাবেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। অসুস্থতা কোন মতেই কমিল না। ভক্তেরা নিশীবাবুকে চিকিৎসা করিবার জন্য লইয়া আসিলেন। নিশী বাবু রামচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আশা অতি কম, তবে ভগবানের ইচ্ছা হইলে ভাল হইতে পারেন।" নানাবিধ উপসর্গের উপর তাঁহার বমনের সময়ে রক্ত উদ্গীরণ হইতেছিল। নিশী বাবুর হতাশ হইবার ইহা এক প্রধান কারণ। তথাপি তিনি আশা প্রদান করিয়া,

ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। যদিও রামচন্দ্রকে ঔষধ সেবন করান হইল বটে, কিন্তু ঔষধ উদরে স্থান পাইতে লাগিল না। সেবনের পরই বমি হইয়া যাইতে লাগিল। কোন উপকার হয় না দেখিয়া রামচন্দ্রও ঔষধের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। নিশী বাবু এই সকল দেখিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে আনা হইল। তিনিও ঔষধ প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু বড় আশাপ্রদ কথা কহিলেন না। ভক্তগণের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া পড়িল। এক্ষণে সকলেই কেবল প্রভুর করুণার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। উপরোক্ত সেবকগণের মধ্যে একজন রামচন্দ্রের আরোগ্যকামনায় অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রভুর মন্দিরে পড়িয়া রহিল। তাহাদের অদৃষ্ট জন্মের মত যে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা তাহারা এত দেখিয়াও বুঝিতে পারে নাই। রামচন্দ্র ২৮শে পৌষ বুধবার দিন যোগোদ্যানে আসিয়াছিলেন, ৩রা মাঘ সোমবার অবধি তাঁহার এরূপ ভাবেই অতিবাহিত হইল।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতেই রামচন্দ্রের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। এক প্রকার অঘোর নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সকলে মনে করিল যে, নিদ্রার পর হয়ত শরীর সুস্থ বোধ করিবেন। দুই তিন দিন অবধি রামচন্দ্র এক প্রকার আহার বন্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে চরণামৃত সেবন করিতেন। সেদিনও সেরূপ ভাবেই গেল। বৈকালে মেডিকেল কলেজ হইতে তাঁহার দুইজন ডাক্তার বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে ও অফিসের অন্যান্য বাবু ও সাহেব প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্য অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইলেন ও জানাইতে বলিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অধিক কথা কহিতে নিষেধ করায় তিনি চুপ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার ঈষৎ দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহারা রামচন্দ্রের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বলিয়া যাইলেন যে, "যদ্যপি রাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস আরও দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে ডাক্তারকে সংবাদ দিও।"

সন্ধ্যার পর রামচন্দ্রের শরীরে আবার ক্লেশ হইতে লাগিল। আর নিদ্রা হইতেছিল না। তিনি একবার শয়ন করিতেছিলেন ও আবার পরক্ষণেই উঠিয়া বসিতেছিলেন। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসও দিবাভাগের অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বকথিত সেবকদ্বয়ের মধ্যে যে হতভাগ্য

রামচন্দ্রের নিকটে ছিল, সে তাহার মাতাকে (রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে*) ডাকিয়া আনিল। এই সময়ে রামচন্দ্রের আর দুইজন শিষ্য অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। রামচন্দ্র তাহাদের একজনকে বড় কষ্ট হইতেছে বলিয়া জানাইলেন। তাহারা উক্ত হতভাগ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সংবাদ দিতে যাইল। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র শীঘ্রই দেহত্যাগ হইবে বলিয়া তাঁহার নিকটস্থ সেই ভাগ্য-হীন দাসকে তাঁহার লোকান্তরের পর তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই চারিটী উপ-দেশ প্রদান করিলেন। সে তখনও কোনপ্রকারেও বুঝিতে পারে নাই যে, শীঘ্রই তাহাকে সেই অমূল্য রত্ন হারাইতে হইবে, সুতরাং সে তাঁহাকে ঐরূপ অকল্যাণের কথা কহিতে নিষেধ করিয়া প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া বসিলেন ও তাহার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া তাহার ক্রোড়ের উপর শয়ন করিলেন। সে তাঁহার ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্রের নয়ন নিমিলীত ও যেন তিনি প্রভুর ধ্যানে আত্মহারা। কেবল তৎপরে দুই একটী দীর্ঘশ্বাস দৃষ্ট হইল। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত শিষ্যেরা কলি-কাতা হইতে ঔষধ লইয়া আসিল। ঔষধ মুখে প্রদান করা হইল, কিন্তু তাহা অধঃস্থ হইল না। ইহা দেখিয়া চরণামৃত প্রদান করা হইল, তাহা ধীরে ধীরে উদরে প্রবেশ করিল। দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই, (রাত্রি প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিটের সময়) আর নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না—রামচন্দ্রের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

* * * * * *

প্রভাত না হইতে হইতেই প্রতিভক্তের গৃহে সংবাদ আসিল, রাম-চন্দ্র ইহলোকে আর নাই। এ সংবাদে অনেকেই তাঁহাকে জন্মের মত দেখিয়া লইবার জন্য দ্রুতপদে যোগোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় বেলা আটটার সময় রামচন্দ্রের দেহ সকলের সমক্ষে আনয়ন করা হইল ও খাটের উপর শয্যা রচনা করিয়া সংস্থাপিত করা হইল। তাঁহারা সেই প্রশান্ত ও বিকচকমলের ন্যায় প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে কোথাও বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই—যেন তিনি নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছিলেন। ভক্তের

* রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রামচন্দ্রের সেবা করিবার জন্য, ২৮শে পৌষ বুধবার, তিনি যোগোদ্যানে আসিলে, আসিয়াছিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্রই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহা-রব উঠিল। তৎপরে রামচন্দ্রের দেহ প্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সংস্থাপিত করা হইল। তখন শিষ্যবৃন্দেরা প্রভুর নিকট আপনাদের প্রাণের দারুণ যাতনায় রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রকে ফুলহারে ও সুগন্ধি চন্দনে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। তাহারা ত তাঁহাকে তাঁহার জীবন-লীলার সময়ে এরূপ ভাবে সাজাইতে পায় নাই। আজ জন্মের মত তাঁহাকে ফুল সজ্জায় ভূষিত করিল। কেহ পাদদেশে, কেহ ললাটে, কেহ বক্ষঃস্থলে চন্দন অনুলেপন করিল। কেহ গলদেশে মালা পরাইয়া দিল। কেহ অঞ্জলিপূর্ণ কুসুম লইয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিল। তৎপরে সকলে তাঁহার পাদদেশে বার বার মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিল। আর যে হতভাগা আশার আশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়া দারুণ অসুস্থতার সময়েও তাঁহাকে বাটী হইতে যোগোদ্যানে লইয়া আসিয়াছিল, যাহার ক্রোড়দেশেই শয়ন করিয়া মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তাহার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল! তৎপরে রামচন্দ্র ও ভক্তগণের আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফ) গ্রহণ করা হইল। তখন ভক্তেরা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে গঙ্গা-তীরে লইয়া যাইলেন। পথিমধ্যে যে তাঁহার সেই শেষমূর্ত্তি দর্শন করিল, সেই হায় হায় করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গঙ্গাতীরে চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতিতে চিতা সজ্জিত করিয়া ভক্তেরা তাঁহার পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র দেহ স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। ধূ ধূ শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

সকলই ফুরাইল। শিষ্যবৃন্দেরা দেহাবশিষ্ট অস্থি লইয়া তাঁহার সেই প্রাণ হইতেও প্রিয়তম যোগোদ্যানে সমাহিত করিল। যোগোদ্যান তেমনিই রহিয়াছে। তেমনিই প্রতিদিন প্রভুর ভোগরাগ ও আরতি হইতেছে। তেমনি নিত্য নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনির সহিত গম্ভীর ও উচ্চকণ্ঠে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। সকলই আছে, কিন্তু সে রাম নাই! তাঁহার সেই প্রশান্ত-মনোহর মূর্ত্তি আর কেহ দেখিতে পায় না! আর রামচন্দ্র তেমন করিয়া হাসি হাসি মুখে তত্ত্ব-কথার আলোচনা করেন না! শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় কহিতে কহিতে তাঁহার নয়ন হইতে ক্ষণে ক্ষণে নিপতিত প্রেমাশ্রুধারাও কেহ দেখিতে পায় না! রামচন্দ্র নিত্যধামে গিয়াছেন, কিন্তু এ নশ্বর জীবনের কত নরনারী যে আশ্রয়হীন হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। দীন দুঃখীরা ত তাঁহার পূতনীরবাহিনী জাহ্নবীর ন্যায়

করুণাধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া রোদন করিতেছেই, কিন্তু যাহারা সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন সংসারপথে তাঁহার করুণার গুণে বিচরণ করিত, তাহারা সকলে প্রাণের আকুলতায় দারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছে।

রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইল। তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কোনটীও বর্ণিত হইল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা এই মহাত্মার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার ত্যাগশীলতা, করুণামাখা হৃদয়, আপনার ইষ্টগত প্রাণ, প্রভৃতি অতুলনীয় গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আদর্শ ভক্ত, বীরভক্ত প্রভৃতি আখ্যা প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইচ্ছা ছিল, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ও আমাদিগের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা অনুসারে তাহা চিত্রিত করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধারণ করিব, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, দুরদৃষ্টবশতই, এক্ষণে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম না। যদ্যপি প্রভুর কৃপায় আবার কখন সুবিধা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণকে পুনরায় মহাপুরুষের গুণকাহিনী শ্রবণ করাইব ও তাহা আলোচনা করিয়াও আপনারা ইহজীবনে কৃতার্থ হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের ত্যাগস্বীকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রকে অনেকেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র যে প্রকার ত্যাগী হইয়াছিলেন, তাহারই দুই একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মহা-পুরুষদের জীবনের ঘটনার কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা বড় কঠিন, কেন না তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন; প্রবন্ধে লিখিয়া বুঝান যায় না। ঠাকুর বলিতেন, ম্যাপে কাশী দর্শন করা, আর কাশীতে গিয়া কাশী দর্শন করা অনেক প্রভেদ। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনুভব করা, আর জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করাও সেইরূপ প্রভেদ। জানিনা, আজ রামচন্দ্রের ত্যাগের বিষয় পাঠ করিয়া পাঠকগণ কি অনুভব করিবেন, তাঁহার ত্যাগের বৃত্তান্ত লিখিবার যদ্যপি তিনি কিঞ্চিৎ শক্তি প্রদান করেন, তবেই কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন, নতুবা নিশ্চয়ই বিফল প্রয়াস হইবে, ইহা আমার স্থির ধারণা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উপদেশ দিতেন, যিনি পূর্ব্বদিকে যত অগ্রসর হইবেন, পশ্চিমদিক হইতে তিনি তত দূরে থাকিবেন। যিনি ভগবানের পথে যতই অগ্র-সর হইবেন, তিনি কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি হইতে ততই দূরে থাকিবেন। কামিনী-কাঞ্চনে যাঁর যত অনাসক্তি দেখা যাইবে, বুঝিতে হইবে, তিনি ততই উন্নতি লাভ করিতেছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, রামচন্দ্র এই উপ-দেশ লাভ করিয়া নিজ জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন কি না। রামচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অ্যাসিণ্টাণ্ট কেমিক্যাল এক-জামিনারের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন দুইশত টাকা ছিল। ইহা ব্যতীত জল, কেরোসিন ইত্যাদি পরীক্ষা (analysis) করিয়াও মাসে কখন কখন দুই তিন শত কখন বা ততোধিক উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার সংসারে পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও রামচন্দ্র কিছুই সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি জানিতেন যে, রামকৃষ্ণদেবই তাঁহাকে অর্থ দিতেছেন, আর তিনিই সেই অর্থ ব্যয় করিতেছেন। অকাতরে ভক্তসেবা করাই তাঁহার কার্য্য ছিল।

আমরা তাঁহার শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি যে, তিনি কখনও ভাবিতেন না যে, তিনি নিজগুণে এই অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি বলিতেন যে, "আমি নিশ্চয় জানি যে, রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার কার্য্যের জন্য এই অর্থ দিতেছেন, আর তাঁহার কার্য্যেই ইহা ব্যয়িত হইতেছে। তাই তাঁহার কাঞ্চনে আসক্তি ছিল না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই তিনটী ঘটনা এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

একদা কোন মাড়োয়ারীর কেরোসিন তৈল চারি জাহাজ বিলাত হইতে আসিয়াছিল। তাহা পরীক্ষা হইবার জন্য কেমিক্যাল এক্জামিনারের নিকট পাঠান হয়। রামচন্দ্রই কেরোসিন পরীক্ষা করিতেন। সেইটীও সাহেব (Chemical Examiner) তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে দেন। রামচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, দুই তিন পয়েণ্ট কম হইয়াছে, সুতরাং ইহা পাস হইতে পারে না। সেই মাড়োয়ারী যখন জানিতে পারিলেন যে, দুই তিন পয়েণ্ট কম হইয়া গিয়াছে, পাস হইবে না, তখন তিনি ভাবিলেন, তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসার ক্ষতি হইবে। তিনি কি করেন, ভাবিয়া প্রত্যেক জাহাজের নিমিত্ত ১০০০০৲ দশ হাজার করিয়া টাকা লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিশেষ অনুনয় বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিলেন যে, আপনি এই টাকা লইয়া ইহা দুই তিন পয়েণ্ট বেশী লিখিয়া পাস করিয়া দিন। বাস্তবিক দুই তিন পয়েণ্ট বেশী লিখিলে কার্য্যের কোন বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহা রামচন্দ্র জানিতেন এবং যদি তিনি তাহা পাস করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আর কোন গোলও হইত না, ইহাও জানিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তখন সেই মাড়োয়ারী চল্লিশ হাজার টাকা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলেন, এই টাকা আপনি গ্রহণ করুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পাস করিয়া দিন, তাহা না হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। তেজীয়ান্ রামচন্দ্র কোন মতে শুনিলেন না, তিনি একমাত্র ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিলেন, আমি ইহা কখনও লিখিতে পারিব না। আমি তিন চারিবার পরীক্ষা করিয়াছি, কেমন করিয়া মিথ্যা লিখিব? ইহা আমি কখনই পারিব না। আমি অর্থের প্রলোভনে ভুলি না। ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাউন। এই বলিয়া তিনি সেই মাড়োয়ারীকে ফিরাইয়া দিলেন। কাঞ্চনে কি অনাসক্তি! ঠাকুরকে লক্ষ্মীনারায়ণ দশহাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি বীরদর্পে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, আর তাঁহার শক্তি-প্রাপ্ত প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র যদ্যপি সেইরূপ চরিত্র

দেখাইতে না পারিবেন, তবে আর রামকৃষ্ণদেবের শক্তি কি? রামচন্দ্র যদ্যপি এইরূপ জীবন দেখাইতে না পারিবেন, তাহা হইলে লোকে রামচন্দ্রের মুখে রামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিবে কেন? তাহা না হইলে রামকৃষ্ণ প্রচার করা কি রামচন্দ্রের শোভা পায়?

এক সময়, কর্ম্মক্ষেত্রে, রামচন্দ্রের উচ্চপদাধিকারী রায় তারাপ্রসন্ন বাহাদুর পেন্সন গ্রহণ করিবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তারাপ্রসন্ন বাবু সাড়ে তিনশত টাকা বেতন পাইতেন। রামচন্দ্রের বেতন দুইশত টাকা। রামচন্দ্রই তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহারই সেই পদ প্রাপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। রামচন্দ্রকে তাঁহার সাহেব বলিলেন, তুমি দরখাস্ত কর, তাহা হইলে তুমিই পাইবে। রামচন্দ্র ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ দরখাস্ত করিলেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে মাসে মাসে বক্তৃতা দিতেন। ঠিক ঐ সময় তিনি বিবেক বৈরাগ্য সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, "আমি না বিবেক বৈরাগ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাইতেছি? এই কি আমার বৈরাগ্য? অন্য লোকে যে পদ পাইবার জন্য কত আশা ও চেষ্টা করিতেছে, আমি বৈরাগ্যের উপদেষ্টা হইয়া সেই আশার মূলোৎপাটন করিবার প্রয়াস পাইতেছি! ধিক্ আমাকে! কেন? আমার কি ২০০৲ দুইশত টাকা বেতনে সংকুলান হইতেছে না? আমি বলিয়া থাকি, প্রভুই আমার ভারগ্রহণ করিয়া সংসারের ব্যয়াদির সংকুলান করিয়া দিয়া আসিতেছেন। তবে কেন আবার ৩৫০৲ সাড়ে তিনশত টাকা বেতনের জন্য দরখাস্ত করিলাম? ইহাই কি বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত?" এই কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মনে অশান্তি আসিতে লাগিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিয়া সেই দরখাস্ত সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন এবং সাহেবের সম্মুখে সেইখানি ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি করিলে? কি জন্য তুমি এইরূপ করিতেছ? তুমি পুনরায় দরখাস্ত কর।" তিনি তখন সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আর অতিরিক্ত বেতনের প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! কি ত্যাগস্বীকার! কেবল মুখে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলে কি হইবে, কার্য্যে আপনি যদি সেইরূপ না করিতে পারেন, তাহা হইলে সে কথা গ্রহণ করিবে কে? তাই কি রামচন্দ্র এইরূপ করিয়াছিলেন? ইহাকেই কি কাঞ্চনে অনাসক্তি বলে? কাঞ্চনে অনাসক্তি না থাকিলে

রামচন্দ্র কখনও কি এরূপ করিতে পারিতেন? অপরের বিনা অনুরোধে, প্রফুল্লচিত্তে কয়জনকে এইরূপ ত্যাগ করিতে দেখা যায়?

আর এক সময়, যখন রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে বাস করিতেছেন, তখন জনৈক মাড়োয়ারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিমন্দির দর্শন করিতে আসেন। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানের গৃহাদি ও নাট-মন্দির প্রভৃতি সমস্ত নিজ ব্যয়ে পাকা করিয়া দিই। রামচন্দ্র তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। কেন না, তিনি জানিতেন যে, এক্ষণে ঐ ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবে, অন্য সময়ে আমাকে বাধ্যবাধকতার বশবর্ত্তী করিয়া তাহার ব্যবসায়ের ঘি তেল ইত্যাদি কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করিবার সময় মন্দ হইলেও ভাল বলাইয়া পাস করাইবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ লোকের দান গ্রহণ করিব না। রামচন্দ্র যদ্যপি অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে যোগোদ্যানে হয়ত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া কত ঐশ্বর্য্যের ঘটা হইত। ইহা রামচন্দ্র জানিয়াও লইলেন না। কেন না, তিনি ত কাঞ্চনের দাস ছিলেন না যে, স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কাঞ্চন গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ত্যাগস্বীকার না দেখাইয়া কেবল মুখে রামচন্দ্র উপদেশ দিতেন না। রামচন্দ্র উপদেশ দিয়াছিলেন, আর নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য। মহৎ লোকের ইহাই প্রধান লক্ষণ। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা তাঁহারা কার্য্যে দেখাইয়া দেন। রামচন্দ্রের জীবনে যে এইরূপ কত ঘটনা আছে, তাহার সংখ্যা করিবে কে? তাঁহার শেষ জীবন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রামচন্দ্রের বিন্দুমাত্রও কাঞ্চনে আসক্তি ছিল না। সেই সকল ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একটী বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়। এ স্থলে এই দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। ইহাতেই রামচন্দ্রের কাঞ্চনে অনাসক্তির আভাস বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

রামচন্দ্রের জীবন যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রামচন্দ্রের জীবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের জ্বলন্ত ছবি। প্রভু যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত রামচন্দ্র নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই প্রভুর প্রধান উপদেশ। রামচন্দ্র সেই উপদেশ পালন করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কাঞ্চনে অনাসক্তির বিষয় বলা হইল, এক্ষণে দেখা যাউক, রামচন্দ্র কামিনীর মায়া ত্যাগ করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের স্ত্রী ছিল, কন্যা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি

তাঁহার মায়া ছিল কি? পাঠক বলিতে পারেন যে, তাহা যগুপি না ছিল, তবে তিনি তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন নাই কেন? কিন্তু তাহা মনে করা ভুল। কেন না, রামচন্দ্র এক সময়ে প্রভুর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন; তাহাতে প্রভু বলিয়াছিলেন, "যোলমাছের ঝাঁক দেখেছ ত? যদি যোলমাছটী কেহ ধরিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার ছানাগুলির রক্ষা হওয়া দায়। সংসার ছাড়িবার তোমার প্রয়োজন কি? সংসারে থাকিয়া যদি অনাসক্ত হ'তে পার, তা হ'লেই কাজ হবে। বাড়ীতে দাসী থাকে। তাহারা বাবুদের ছেলে মানুষ করে, তাহাদের কত যত্ন করে, আবার কেউ মরিয়া গেলে কত কাঁদে, কিন্তু তারা মনে মনে জানে যে, এরা আমার কেউ নয়। আমার আপনার লোক দেশে আছে। সেইরূপ সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারে পরিবৃত হইয়াও ঈশ্বরের সংসার বলিয়া জ্ঞান কর, আর ঈশ্বরকেই আপনার বলিয়া জান। স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে থাকা দুদিনের জন্য, এই জ্ঞান রাখিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও, তাহা হইলে আর সংসারে থাকিলেও দোষ নাই।" রামচন্দ্র এই উপদেশ অনুযায়ীক নিজ জীবন শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী ঘটনা এই স্থানে বলিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসম্বরণ করিবার কিয়ৎকাল পরে, এক দিন রামচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁহার একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা সন্ধ্যাবেলা খেলা করিতে করিতে হঠাৎ বস্ত্রে অগ্নি লাগাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় কেহই তাহার নিকট ছিল না। সে নিতান্ত বালিকা, তাহার জ্ঞান নাই যে, সে তাহাতে পুড়িয়া যাইবে। ক্রমে সেই অগ্নিতে তাহার বস্ত্রাদি ধরিয়া গিয়া গাত্রে সংলগ্ন হইল। তখন সে চীৎকার করিল। সকলে দৌড়িয়া আসিল। নিকটেই বাটীর দাসী ছিল। সেই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া বুদ্ধিভ্রমে জল ঢালিয়া নিবাই-বার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। বালিকা তাহাতে আরও যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। ক্রমে ভয়ানক গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ডাক্তারের চিকিৎসাসত্ত্বেও এইরূপে দুই এক দিবস দিবারাত্র গাত্রদাহে ছটফট করিয়া শেষে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইল। পাঠকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন! সাংসারিক লোকের পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! পিতা মাতার আদরের সামগ্রী, পিতা মাতার সম্মুখে অগ্নিদাহে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, ইহা দেখিয়া পিতামাতার মনে যেরূপ দারুণ কষ্ট হয়, তাহা সাংসারিক ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, তাহাতে আবার সে বাল্যকাল হইতেই হরিনামে

উন্মত্তা, দিবারাত্রই কেবল হাতে তালি দিয়া হরিনাম করিত, এমন স্নেহের পুত্তলী পিতামাতার সম্মুখে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, "বাবা গো! মা গো! প্রাণ যায়! বাবা গো! একবার ধর! মা গো! গা পুড়ে গেল! একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও! বাবা গো! এযে কমে না! মা গো! মরে গেলুম! কি করি!" এইরূপ বিলাপধ্বনি করিতেছে, আর পিতামাতার একবিন্দুও শক্তি নাই যে, তাহার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া দিবে। এইরূপ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হইল। এই অবস্থায় পিতামাতার মনে যে কি হইতে থাকে, তাহা সেই অবস্থাচক্রে যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারেন। সে যাহা হউক, রামচন্দ্রের এই বিপদের সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য মানসিক বল ও পরিবারবর্গের প্রতি অদ্ভুত মায়াত্যাগ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "প্রভুই কন্যা দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াছেন, ইহাতে আমার দুঃখ করিবার কি অধিকার আছে?" এই প্রকার উত্তর শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, আর মনে করিলেন যে, ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি। তাঁহারই শক্তিতে রামচন্দ্র এরূপ বলিতে পারিতেছেন।

রামচন্দ্র জানিতেন যে, প্রভুই তাঁহার আপনার, আর এ সংসার অনিত্য, এই আছে, এই নাই, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল বলিয়াই এইরূপ মানসিক বল দেখাইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে থাকাকেই প্রভু সংসারে দাসীর মত থাকা বলিতেন। রামচন্দ্র তাহা জীবনে দেখাইলেন। জনকরাজা পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিদেহ নগর দগ্ধ হইয়া গেলেও তাঁহার মনে কিছুই অশান্তি হইবে না। আর রামচন্দ্রের আত্মসম্ভূতা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা সম্মুখে দগ্ধ হইয়া যাইল, তথাপিও রামচন্দ্রের মনে কিছুই শোকাবেগ হইল না। সংসারে থাকিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন যে, সংসারে জ্ঞান কি হয় না? যদি না হয়, তবে জনকরাজার হইয়াছিল কেমন করিয়া? এই কথা, এই জনকরাজার দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া, সকলেই পার হইতে চাহেন, কিন্তু এতাবৎকাল জনকরাজা ভিন্ন আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের কথা শুনা যায় নাই। রামচন্দ্র সেই দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। রামচন্দ্রই সংসারে থাকিয়া পূর্ণজ্ঞানীর লক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি যে, রামচন্দ্র যথার্থ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ছিলেন, রামচন্দ্র যথার্থ সন্ন্যাসীপদবাচ্য।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কাহাকে বলে? যাঁহারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া জনসাধারণে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত অন্নের সংস্থান নাই, তাই তাঁহারা সন্ন্যাসী! আবার কাহার হয়ত পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন। আবার কাহার কাহার হয়ত পিতামাতা আত্মীয় স্বজন আছেন, কিন্তু সংসার প্রতিপালনের ভার হয়ত তাঁহাদের উপর ছিল না, তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এ সকল সন্ন্যাসীগণের সংসার ত্যাগকে বিশেষ বৈরাগ্যের প্রভাবসম্ভূত বলা যায় না। কিন্তু যাঁহারা কুমার-সন্ন্যাসী অথবা যাঁহাদের পিতামাতা বা স্ত্রী পুত্র আছে ও তাঁহাদের প্রতিপালন করিবার অন্য কেহ নাই, তাঁহারাই তাঁহাদের অন্ধের যষ্টিস্বরূপ, ভগবান্ লাভের জন্য এ সকল ব্যক্তিকে যদ্যপি সন্ন্যাসী হইতে, অথবা সংসারে মায়া ত্যাগ করিতে দেখা যায়, তবেই বৈরাগ্যের প্রভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

রামচন্দ্রের পিতা ছিল, স্ত্রী ছিল, কন্যা ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র শেষজীবনে পিতার অনুমতি লইয়া সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে আসিয়া প্রভুর সেবায় রত হইলেন। যোগোদ্যানে যখন প্রভুর সমাধি দেওয়া হইল, তখন নিত্যপূজার জন্য রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। এই ব্রাহ্মণ ও সময়ে সময়ে প্রভুর কোন ভক্ত আসিয়া প্রভুর সেবা করিতেন। রামচন্দ্র প্রতি রবিবারে এবং মাঝে মাঝে প্রত্যুষে আসিয়া সেবাকার্য্য কিরূপ হইতেছে, দেখিয়া যাইতেন। এক দিবস তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। ঠাকুরের মিষ্টান্ন ভোগ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে পিপীলিকা পরিবেষ্টিত। ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন যে, বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ আর কি সেবা করিবে? এই ভাবিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই দিবসই পিতার অনুমতি লইয়া যোগোদ্যানে নিজে আসিয়া সেবাকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহে স্ত্রী ছিল, কন্যা ছিল, পিতা ছিল, রামচন্দ্র ত তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ ছিলেন না যে, তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া প্রভুর সেবা করিতে আসিতে দ্বিধা করিবেন। যোগোদ্যানে বাস করা তখন কি প্রকার দুঃসাধ্য, তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত উদ্যানই বর্ষায় ডুবিয়া যাইত। ইহার উপর আবার ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

বিশেষরূপে ছিল। চারিদিকে নর্দ্দামার জল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইত; রাস্তা কাঁচা ছিল, কাজেই এক হাঁটুর উপর কাদা হইত। তখনকার যোগো-দ্যানের অবস্থা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। এক কথায় এইস্থান বাস কবিবার যোগ্য ছিল না। তাই প্রভুর কোন ভক্তই এখানে থাকিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্রের কি ত্যাগস্বীকার! প্রভুর সেবার জন্য পিতা, স্ত্রী, কন্যার মায়া ত্যাগ করিয়া এমন কি আপনার প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এই ভয়ানক জঙ্গলে আসিয়া বাস করিলেন! যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও যাহাতে শরীর ভাল থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু রামচন্দ্র সে দিকেও দৃষ্টিপাত করিলেন না। গৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় স্ত্রী, তাহা রামচন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্রও অধিকার করিল না। কি আশ্চর্য্য! সংসারে থাকিয়া সংসারীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াও রামচন্দ্রের সংসারে মায়া ছিল না! তাই বলিয়াছি, রামচন্দ্র কামিনীকাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে আর একটী কথা না বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না। রামচন্দ্রের অন্তিম সময়ে যখন তিনি হাঁপানি, বহুমূত্র, albumenuria ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছেন, তখন একদিন, তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে বলিল যে, "মহাশয়! এত অর্থ উপায় করিলেন, কিন্তু কিছুই রাখিবার চেষ্টা করিলেন না, আপনার স্ত্রীর কি হইবে?" এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সহাস্যে বলিয়াছিলেন যে, "ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিশ পচিশ হাজার টাকা রাখিতে পারিতাম, কিন্তু আমি একদিনের জন্যও ভাবি নাই যে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিতেছি। প্রভুই আমাকে ও আমার স্ত্রীকে উভয়কেই খাইতে দিতেছেন। আমি মরিয়া গেলে, এখন যিনি খাওয়াইতেছেন, তখনও তিনিই উঁহাকে খাওয়াইবেন।" একেই না বলে মায়াত্যাগ! যদ্যপি তাঁহার স্ত্রীর প্রতি একবিন্দুও মায়া থাকিত, তাহা হইলে অন্তিম সময়ে তাঁহার জন্য রামচন্দ্রের দুঃখ হইত। এমন দেখা যায়, কেহ কেহ হয়ত বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ব্যয়াদি করিয়া কিছুই রাখিতেও পারেন নাই, কিন্তু যখনই তাঁহাদের সংসারের কথা মনে পড়িয়াছে, তখনই তাঁহারা অনুতাপ করিয়াছেন, আর ভাবিয়াছেন যে, কেন তখন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি নাই? কিন্তু রামচন্দ্র এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তাই বলিতেছি যে, এরূপ ত্যাগী মহাপুরুষ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? ত্যাগ ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না। ত্যাগই ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। ইহাই রামচন্দ্র

বুঝিয়াছিলেন, তাই ত্যাগী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রামচন্দ্রের ত্যাগ দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া উঠিয়াছেন! তাই রামচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা করিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া সংসারে থাকিয়া কি প্রকার জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহার আদর্শ রামচন্দ্র। এই আদর্শ দেখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসু সংসারী ব্যক্তিমাত্রেই আপন জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিলে. যে অপার ভগবদ্প্রেমের রসাস্বাদ পাইয়া সংসারের মায়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্পাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তি।

মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে, আমাদের হৃদয়ে সাহস ও বল আসে, এই ভবসমুদ্রের অকুল কিনারায় আমরা কুল পাইবার আশা পাই এবং আমাদের পাপপূর্ণ মনে পুণ্য ভাবের সঞ্চার হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা ক্ষুদ্র নরাধম, আর রামচন্দ্র প্রভু রামকৃষ্ণদেবের একজন সাঙ্গোপাঙ্গ। পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণদেবের সাঙ্গোপাঙ্গেরা মনুষ্য বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় না। ইহাঁরাও সকলেই মহাপবিত্র, অসীমশক্তিসম্পন্ন দেবতাবিশেষ। সেই দেবতাদিগের বুঝিবার শক্তি দেবের কৃপা ব্যতীত হয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের জীবনে সেই সকল উপদেশ প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ইঁহারা তাঁহার লীলার পুষ্টিসাধন করিবার জন্যই আসিয়াছেন। সেবক রামচন্দ্রের জীবন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়া-ছেন যে, রামচন্দ্রের জীবন প্রভুর উপদেশের জলন্ত ছবি। কিরূপে সাংসারিক ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া প্রভুর উপদেশ অনুযায়ীক কার্য্য করিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্যই রামচন্দ্র আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্র হইতে অনেক

বিষয় শিক্ষা করা যায়। তন্মধ্যে তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিই প্রধানতম। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তির বলেই আজ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিতে জগত প্রস্তুত। এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তির দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতায় পরিতৃপ্ত না হওয়ায় রামচন্দ্রের মনে অশান্তি আসিলে, রামচন্দ্র ১৮৭৯ সালে প্রভু রামকৃষ্ণদেবের নিকট যান। কিছু দিন যাতায়াতের পর, প্রভু তাঁহাকে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে বলেন। তিনি যতই চৈতন্যচরিত পাঠ করিতে থাকেন, ততই যেন প্রভুর জীবনই দেখিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার চৈতন্য বলিয়া জ্ঞান হইল। এই সময় হইতেই প্রভুকে তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যাইল। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ মধ্যে রামচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য সকলকে যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, অনেকেই তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে রামচন্দ্রের বিশ্বাস কোন অংশেই ন্যূন হয় নাই। আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় রামচন্দ্র সদাই প্রভুর আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত ছিলেন। ঠাকুর রামচন্দ্রকে যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, রামচন্দ্র তৎসমস্তই প্রাণপণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে, গুরু যাহা কিছু বলিবেন, শিষ্য তৎক্ষণাৎ বিনাবিচারে তাহা প্রতিপালন করিবেন। রামচন্দ্রে এই শাস্ত্রবাক্য প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে। রামচন্দ্র জীবনে কখনও ভুলিয়াও এমন কোন কার্য্য করেন নাই, যাহা রামকৃষ্ণদেব নিষেধ করিয়াছেন। ঠাকুর এক সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ভক্তের অর্থ উপার্জ্জন শাঁকোর জলের মতন হওয়া উচিত, অর্থাৎ একদিক দিয়া আসিবে, আর এক দিক দিয়া চলিয়া যাইবে। রামচন্দ্র পরশ্ব দিবস কি হইবে না ভাবিয়া অকাতরে ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়াছেন। প্রভুর জন্য ব্যয়াদি করিতে রামচন্দ্র ক্ষণ-কালের জন্য কখনও দ্বিধা করেন নাই। অর্থ কোন ছার, রামচন্দ্র প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি মন প্রাণ সমস্তই প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়ে দ্বিধা করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না! বাস্তবিকই, রামচন্দ্রের কোন বিষয়ে আপনার বলিয়া বোধ ছিল না, সমস্তই প্রভু রামকৃষ্ণের, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই কার্য্য করিয়াছেন। প্রভু রামকৃষ্ণদেব কিরূপে, রামচন্দ্রকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে প্রভুর জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। যে

দিন রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শয়নগৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, "কি চাও ?" সেইদিন হইতেই রামচন্দ্র জানিতেন যে, তিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। সেই দিন রামচন্দ্র, কি অহৈতুকী ভক্তির ভাবই দেখাইয়া গিয়াছেন! দেখিতেছেন, সম্মুখে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর কল্পতরু হইয়া বলিতেছেন, "কি চাও ?" আর রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছেন, "কি চাহিব ! এই সময় যাহা চাহিব, তাহাই পাইব," ইহা তাঁহার স্থির ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই চাহিলেন না কেন ? তিনি ত সামান্য স্বার্থপর মনুষ্যের ন্যায়, কোন স্বার্থ চরিতার্থ করিতে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যান নাই। অর্থ—একবার ভাবিলেন, অর্থ চাহিব কি ? অমনি মনে করিলেন, ছি ! ছি ! অর্থ, প্রভু বলিয়াছেন, ভগবান্ হইতে দূরে রাখিয়া দেয়। ইহা চাহিব না। তবে কি চাহিব ? পৃথিবীর সমুদয় বস্তু একে একে চাহিবার জন্য মনে করিলেন, কিন্তু কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। ভাবিলেন, সমুদয় বস্তুই প্রভুর চরণ ছাড়া করিবার চেষ্টা করিবে। তখন তিনি বলিলেন, "প্রভু ! কি চাহিব জানি না, আপনিই বলিয়া দিন, কি চাহিব !"

কি বিশ্বাস ও ভক্তির কথা ! ইহা বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য কোথায় ! যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ভক্তি করিয়া মন প্রাণ সর্ব্বস্ব যাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার চাহিবার কি থাকিবে ? যে মনে তিনি চাহিবেন, সেই মন কি তাঁহার ? তাহা তিনি যে প্রভুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন। যদি তাঁহার তখনও আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি তাঁহার তখনও চাহিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন কৈ ? ইহাতে রামচন্দ্র জগতকে এই দেখাইলেন যে, যদ্যপি ভগবানে পূর্ণবিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তাহা হইলে কামনা বর্জ্জিত হও। আর দেখাইতেছেন, হে মানবগণ ! যদ্যপি ইষ্টদেবই কৃপা পরবশে দর্শন দিয়া তোমাকে বর দিতে প্রস্তুত হ'ন, তথাপি বরদানরূপ আশার ছলনায় ভুলিয়া গিয়া কামনা করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পতন হইবে। বর গ্রহণ করিলে, বর লইয়া ভাসিয়া যাইতে হইবে, বরদাতাকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রামচন্দ্র যে দিন রামকৃষ্ণদেবকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া কখনও কোন দিন আহারাদি করিতেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রভুর প্রসাদি কোন মিষ্টান্নাদি আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া দিতেন এবং প্রত্যহ স্নানের পর এক

বিন্দু প্রসাদ পাইয়া তবে আহারাদি করিতে বসিতেন। প্রসাদ ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তিনি প্রভুর নিকট গমন করিয়া পুনরায় লইয়া আসিতেন। এক সময়ে বাড়ীতে প্রসাদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, কাজেই সেইবার প্রসাদ একেবারে ফুরাইলে তিনি প্রভুর নিকট যাইলেন। যখনই যাইতেন, প্রায়ই কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। এবারেও তাহাই করিয়াছেন। সমস্ত দিবস প্রভুর নিকট রহিলেন, তথাপি প্রভু কিছুই খাইতেছেন না। মিষ্টান্ন লইয়া কতবার তাঁহার নিকট ধরিলেন, কিন্তু সে দিবস তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পর দিবস কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে, সে জন্য সেই রাত্রেই বাড়ী আসিতে হইবে। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, কি করি? কেমন করিয়া ফিরিয়া যাই, প্রসাদ ত পাইলাম না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, অন্য কোথাও কাহার নিকট প্রসাদ নাই। প্রভু পঞ্চবটীর ধারে গিয়াছেন, এমন সময় রামচন্দ্র কিছুই না পাইয়া শেষে প্রভুর একটী ডাবর দেখিতে পাইলেন। ইহাতে দেখিলেন, প্রভুর শ্রীমুখবিনিঃসৃত শ্লেষ্মা ও লালা রহিয়াছে। রামচন্দ্র প্রভুর মিষ্টান্নের হাঁড়ি হইতে দুই চারিটী লইয়া সেই শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত করিলেন এবং তাহাই অম্লানবদনে প্রভুর প্রসাদ জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার মানস করিলেন। ভক্তের ভগবান্, তৎক্ষণাৎ আসিয়া মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রসাদ দিলেন।

ধন্য সেই মহাপুরুষ! ধন্য তাঁহার ভক্তি! এই ত্রিপাদ পাপে পূর্ণ ঘোর কলিতে এরূপ স্বর্গীয় বিমল ভক্তির ভাব রামচন্দ্র দেখাইয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! এইরূপ ভক্তি কাহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায়? এ সকল অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিলে আজকাল গল্প বলিয়া মনে হয়। মনুষ্যে কি সম্ভবে? তাই বলিয়াছি, দেব চরিত, দেবের কৃপা ব্যতীত বুঝা যায় না।

রামচন্দ্র প্রভু রামকৃষ্ণদেবকে যেরূপ ভক্তি করিতেন ও তাঁহাতে তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, ইহা যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন বা করিবেন, সকলেই এক বাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহা তাঁহার যোগাই বটে। রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তি রামচন্দ্রেই ছিল, ইহার আর তুলনা হয় না।

রামচন্দ্রই প্রভুর সেবা বুঝিয়াছিলেন, রামচন্দ্রই রামকৃষ্ণ চিনিয়াছিলেন, রামচন্দ্র রামকৃষ্ণসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন! রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা

তাঁহার মুখে ছিল না, রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা ছিল না, রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা শ্রবণ করিতেন না, আর রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনরূপ কাহাকেও ধ্যান করিতে বলিতেন না। রামকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন, রামকৃষ্ণই তাঁহার প্রাণ। আর যে কেহ রামকৃষ্ণ নাম বলিয়াছে, সেই তাঁহার পরম আত্মীয়।

প্রভু নিত্যানন্দ বলিতেন, "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে যে আমার প্রাণরে॥" আর এই ভাব রামচন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কপটী, অবিশ্বাসী, মহাপাপী, মহাপাপীর মানব যত্মপি রামকৃষ্ণ নাম করিয়াছে, অমনি রামচন্দ্রের ক্রোড়ে সাদরে স্থান পাইয়াছে, অমনি রামচন্দ্রের আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় হইয়াছে।

আহা! একেই না ব'লে রামকৃষ্ণে ভক্তি! এরূপ ভক্তি ত কোথাও দেখা যায় নাই, এরূপ ভক্তিও কি মানবে দেখা যায়? এ সকল কথা শ্রবণ করিলেও পুণ্য আছে। রামচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা যিনি চিন্তা করিবেন, তাঁহার শুষ্ক হৃদয় হইলেও ভক্তিতে আর্দ্র হইবে! তাই বলি, যত্মপি বিশ্বাস ও ভক্তি কাহাকে ব'লে জানিতে চাও, তবে রামচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা কর, রামচন্দ্রের গুণগান কীর্ত্তন কর। রামচন্দ্র-চরিত্র যখন সকলে বুঝিতে পারিবেন, রামচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাসের ছবি যখন সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে, তখন বিমল প্রেমের সঞ্চার হইবে এবং তখনই রামকৃষ্ণ-কৃপা অনায়াস-লভ্য হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ভক্তি দুই প্রকার। জ্ঞানমিশ্র ভক্তি ও প্রেমাভক্তি। এই প্রেমাভক্তি, গোপীদের ছিল। এ ভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। প্রেমাভক্তির লক্ষণ, "অহংতা" আর "মমতা।" যেমন, যশোদা মনে করিতেন, তিনি ভিন্ন গোপালকে কে খাওয়াইবে। তিনি না দেখিলে কে দেখিবে। আর "মমতা," ভালবাসা। গোপাল ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, গোপালই সর্ব্বস্বধন। গোপালগত প্রাণ। আমরা রামচন্দ্রে এই প্রেমাভক্তি দেখিয়াছি। রামচন্দ্র প্রভুর সেবা ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না। প্রভুর সেবার কোন ত্রুটী দেখিলে অমনি রামচন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেন। আর তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। যিনি যত বড়ই ভক্ত হউন না কেন, সেবাকার্য্যে এক বিন্দু ত্রুটী করিলে, অমনি রামচন্দ্র তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। রামচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাহাতে প্রভুর সেবা ভালরূপে হয়। ভক্তের ভগবান্ তাই প্রভু রামকৃষ্ণদেবও রামচন্দ্রের উপর সেবাকার্য্যের ভার দিতেন। যেখানে যে কেহ প্রভুকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া প্রভুর সেবা করিবেন ও

মহোৎসবাদি করিবেন মনে করিতেন, রামচন্দ্রের অনুমতি ভিন্ন কেহই তাহা করিতে পাইতেন না। প্রভু বলিতেন, "রামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় ক'রো।" সেইজন্য প্রভুকে লইয়া যেখানে মহোৎসব হইয়াছে, সেইখানেই রামচন্দ্র সেই কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছেন। রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে গিয়া প্রভুর সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যেখানে রামকৃষ্ণদেব, রামচন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তারূপে তথায় বিরাজিত। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বাভিমানী বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। কেন না, প্রভু বলিয়াছেন যে, প্রেমাভক্তিতে "অহংতা" থাকে। রামচন্দ্রের প্রেমাভক্তি ছিল, তাই এই "অহংতা" দেখা গিয়াছিল। এই উচ্চ স্বর্গীয় প্রেমাভক্তির ভাব যাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে রামচন্দ্র যেরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, যেরূপ দীনতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কে না জানে?

বিশ্বাস ও ভক্তির আদর্শ কিরূপ, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রভু রামকৃষ্ণদেব একটী গীত গাহিতেন।

গীত।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
(সে যে,) না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী ছাড়া কথা না শোনে কানে,
পূজা সন্ধ্যা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই তা জানে॥
যে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থূল, সহজে হ'য়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেনে

বিশ্বাস ও ভক্তির চরম অবস্থায় মানবহৃদয় কি প্রকার হইয়া যায়, ইহাই এই গীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব এই গীত গাহিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন, আর রামচন্দ্র ইহা নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। এই গীতের প্রত্যেক ভাবটী রামচন্দ্রে দেখিতে পাইবেন, এই গীতের অক্ষরে অক্ষরে রামচন্দ্রে মিলিয়াছে, কেবল কালীর স্থানে রামকৃষ্ণ জানিলেই হইল। এই গীত গাহিলেই রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। যেন রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই এই গীত প্রণীত হইয়াছে। রামচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবকে জানিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কখনও কোন তীর্থ পর্য্যটনে যান নাই, যাইবার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। তীর্থ পর্য্যটন পরের কথা, এমন কি গঙ্গার কূলে (কলিকাতায়) বাস করিয়াও, কখনও গঙ্গাস্নান করিবার বাসনাও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই।

রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তি।

কোন সময়ে গঙ্গায় মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ মহাযোগ কখনও হয় নাই। কত দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র মনুষ্য গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতেছেন। কত বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও গঙ্গাস্নান বাসনায় কলিকাতাভিমুখী হইয়াছেন। কত গৃহস্থের কুলবধূ আপন আপন সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় লোকে লোকারণ্য! হিন্দুপল্লীর প্রতি পাড়ার প্রতি গৃহে অসংখ্য লোক সমাগত হইয়াছে! যাহার যে যেখানে কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন আছেন, সকলেই গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কাহার না গঙ্গাস্নান বাসনা আপনি উদিত হয়? রামচন্দ্রের গৃহের মহিলাগণ গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা করিয়াছেন এবং রামচন্দ্রকে তাহা জানাইয়াছেন। রামচন্দ্র কখনও কাহাকেও পুণ্যকর্ম্ম করিবার বাসনায় বিঘ্ন প্রদান করেন নাই। ইহা তাঁহার স্বভাব ছিল না। রামচন্দ্রের বাটীতে এমন দ্বিতীয় পুরুষ কেহ নাই, যিনি তাঁহাদের লইয়া গঙ্গাতীরে যাইতে পারেন। সুতরাং রামচন্দ্র নিজেই তাঁহাদের লইয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গঙ্গার তীরে যাইলেন, মা জাহ্নবীকে প্রণাম করিলেন, মহিলাদের বলিলেন, "যাও, তোমরা স্নান করিয়া আইস।" তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলেন। রামচন্দ্র তৎপরে গাড়োয়ানকে গৃহাভিমুখে যাইতে বলিলেন। তখন মহিলাগণ বলিলেন, "কৈ! তুমি স্নান করিলে না?" তিনি বলিলেন, "আমার ত পুণ্যের আবশ্যক নাই, যে এই মহাযোগ দেখিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব! আমি প্রত্যহ যেমন যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করি, সেইরূপই যোগোদ্যানে গিয়া স্নান করিব।" কি ভক্তি! কি নিষ্ঠা! রামকৃষ্ণে কি বিশ্বাস! ইহা বুঝিতে পারিবার শক্তি কৈ? কোটী কোটী মনুষ্য কত আগ্রহের সহিত, ভক্তির সহিত, গঙ্গাস্নান করিতেছেন, কোটী কোটী মনুষ্য সেই মহাযোগে স্নান করিয়া আপনাকে ধন্য ও পুণ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও, গঙ্গাস্নানে জীবন পবিত্র হয়, ইহা বিশ্বাস করিয়াও, রামচন্দ্র সেই দিবস গঙ্গাস্নান না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন! এরূপ নিষ্ঠা ভক্তি কখনও দেখি নাই। ইহা দ্বারা নিষ্ঠা কাহাকে বলে রামচন্দ্র দেখাইলেন। ইহাকে গোঁড়ামী বলে না। কেন না, রামচন্দ্রের মনে স্থির বিশ্বাস যে, গঙ্গাস্নানে জীবন পবিত্র হয়। তাহা না হইলে তিনি আপন বাটীর মহিলাদের আপনি সঙ্গে করিয়া আনিতেন না। অথবা গোঁড়ামী থাকিলে বলিতেন, গঙ্গাস্নান করিয়া কি হইবে? রামকৃষ্ণদেবের ভজনা কর,

তাহা হইলেই পবিত্র হইবে। তাই বলিতেছি, ইহাকেই বলে নিষ্ঠা। রামচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস, যখন রামকৃষ্ণদেব কৃপা করিয়াছেন, তখন পবিত্র হইতে পবিত্রতম হইয়াছি, আর পুণ্যের প্রয়োজন নাই। তাই কখনও কোনও তীর্থ পর্য্যটন করিবার বাসনাও করেন নাই।

রামকৃষ্ণদেব যে স্থানে থাকিতেন, যে গৃহে বা স্থানে একবার পদার্পণ করিতেন, সেই স্থানকেই পরম তীর্থ বলিয়া রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। যে কেহ রামকৃষ্ণদেবের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, যে কেহ রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন, যে কেহ রামকৃষ্ণদেবকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনিই মহা পবিত্র, তিনিই পুণ্যবাণ, ইহাই রামচন্দ্রের মুখে বার বার আমরা শ্রবণ করিয়াছি। রামচন্দ্র বলিতেন, এমন কি, যে গাড়ীতে তিনি উঠিয়াছেন, সেই গাড়ীর কোচম্যান, সহিস, গাড়ী, ঘোড়া পর্য্যন্ত সমস্তই পবিত্র হইয়া গিয়াছে। একদা কতিপয় লোকের সম্মুখে এই কথা তিনি বলিতেছিলেন, একজন তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, "তাহা হইলে আর ভাবনা কি? কত লোক তাঁহাকে রাস্তায় ঘাটে দর্শন করিয়াছে, কত গাড়ীতে তিনি চড়িয়াছেন, তাহাদের কোচম্যান সহিস, সকলেই ত দেখিয়াছে, তাহারা কি আর তা ব'লে মুক্ত হ'য়ে যাবে?" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রিমা আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং হুঙ্কারধ্বনি করিয়া রামচন্দ্র উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "যা, যা, যা, যা! সেই গাড়োয়ান সহিসের পায়ের ধূলো একটু নিগে যা। যা, যা, যা! যে ম্যাথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই মেথরের একটু পায়ের ধূলো নিগে যা। তোর মত লোকের লক্ষ্য লক্ষ্য জীবন পবিত্র হ'য়ে যাবে!" অহো! সেই দিনকার দৃশ্য ও সেইদিন রামচন্দ্রের মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে যেন রামকৃষ্ণ-ভক্তি রামচন্দ্র জোর করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া দিয়াছেন! আর যিনি প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, তিনি কিয়ৎকাল পরেই রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন! তাই বলিয়াছি, রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভিন্ন কিছু জানিতেন না। রামকৃষ্ণ-কথামৃত ভিন্ন অন্য কোন কথা শ্রবণ করিতেন না, রামকৃষ্ণ-পূজা ভিন্ন অন্য কিছু পূজা সন্ধ্যা জানিতেন না এবং রামকৃষ্ণ যা করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য," এই ধারণাই চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল।

রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তির কথা যতই আলোচনা করিতে থাকি, ততই আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের বিমল বিশ্বাস ও অহৈতুকী

ভক্তির কথা যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, তাঁহারও জীবন পবিত্র হইয়া রামকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে। সেই স্বর্গীয় দেবচরিত বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রামচন্দ্রের ভক্তির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের উপর যে সংস্কার হইবে, তাহা অপেক্ষা তিনি কত উচ্চ, তাহা কেমন করিয়া জানাইব? রামকৃষ্ণদেবের উপর রামচন্দ্রের যে অটল বিশ্বাস ও শুদ্ধাভক্তি ছিল, তাহার কোটী কোটী দৃষ্টান্ত তিনি জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যে কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সংক্ষেপে যে কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ব্যতীত হয়ত কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ কেহ দেখিয়াছেন, তাহা কে লিপিবদ্ধ করে? এ অধীনের যে কয়েকটী কথা আপাততঃ স্মরণ হইতেছে, তাহাই এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিলাম। তন্মধ্যে আর দুই একটী কথা না লিখিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না।

কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে যখন রামচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন তথায় প্রভু রামকৃষ্ণদেবের মন্দির দর্শন করিতে কত সহস্র সহস্র লোক আসিতেন। তন্মধ্যে, যে কেহ রামচন্দ্রের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেবকে একবার ভগবান্ বলিয়াছে, অমনি রামচন্দ্র তাহার আত্মীয় হইয়া গিয়াছেন। আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য এমন সহজ উপায় জানিয়া কেহ কেহ কয়েকবার যোগোদ্যানে যাতায়াত করিয়া ও রামকৃষ্ণদেবের উপর ভক্তি দেখাইয়া কত অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। রামচন্দ্র বলিতেন "যে কেহ রামকৃষ্ণদেবকে ভক্তি করে ও রামকৃষ্ণ নাম বলে, আমি তাহার গোলাম।" এ কথা আমরা তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছি। কাজেও তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া একবার "জয় রামকৃষ্ণ" বলিলেই হইল, কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানে আসিয়া প্রভু রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া ভক্তি দেখাইয়া প্রণাম করিলেই হইল, অমনি রামচন্দ্র গলিয়া গিয়াছেন! তখন যাহা চাহিবে, রামচন্দ্র তাহাই দিতে প্রস্তুত। রামচন্দ্র একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না যে, সে কপটী, অবিশ্বাসী, মহাপাপী, আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিতে আসিয়াছে কি না? তাহার মুখে রামকৃষ্ণ নাম শুনিয়া, আর রামচন্দ্র বিচার করিতে পারিতেন না। ভাবিয়া দেখুন! এরূপ সরল, অকপট বিশ্বাস কি এই ঘোর কলিকালে দেখা যায়, না শুনা যায়? এই ভাবকেই বলে, "যে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থূল, সহজ হ'য়েছে বিষয়ে ভুল।"

রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ-প্রসাদ অগ্রে গ্রহণ না করিয়া অন্য কিছুই ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। যখন রামচন্দ্র কতিপয় শিষ্যসমেত যোগোদ্যানে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন রাত্রিকালে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে গিয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থানে না বলিয়া থাকা যায় না। সেই সময় রামচন্দ্র রোগাক্রান্ত, সুতরাং প্রাতে অল্প করিয়া অন্নপ্রসাদ এবং রাত্রিকালে একটু সুজির পায়েস ভক্ষণ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, যোগোদ্যানে রামচন্দ্র প্রভুর সেবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সেইজন্য কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেও সহজে তিনি যোগোদ্যান ছাড়িয়া গৃহে থাকিতেন না। সেই সময় যোগোদ্যানে একটী গাভী দুগ্ধ দিত। সেই দুগ্ধে প্রত্যহ রাত্রিকালে ঠাকুরের সুজির পরমান্ন ভোগ হইত। রামচন্দ্র তাহাই প্রসাদ পাইতেন। একদিন বাছুর দুগ্ধ খাইয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় নিকটে অন্য কোথাও তখন দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না। আবার রামচন্দ্রের একজন শিষ্য ব্যতীত অন্য কেহই সন্ধ্যার সময় ছিলেন না। তিনি ঠাকুরের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সহর হইতে দুগ্ধ আনিয়া ভোগ দেওয়া, সেই দিবস সুবিধা হইল না। ঠাকুরের ভোগ হইবার পরেই রামচন্দ্র ও তাঁহার অন্যান্য দুইটী শিষ্য আসিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন সহর হইতে দুগ্ধ আনিলেন। তৎপরে সুজির পরমান্ন প্রস্তুত হইল। কিন্তু রামচন্দ্রকে এই বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। তাঁহার অসুস্থ শরীর, পাছে রাত্রে কিছুই আহারাদি না হয়, সেইজন্য শিষ্যগণ প্রসাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই সুজি রামচন্দ্রকে দিলেন। নিষ্ঠাভক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! রামচন্দ্রের মনে সন্দেহ হইয়াছে, তিনি মুখে তুলিতে যাইতেছেন, আর খাইতে পারিতেছেন না। বলিলেন, "হাঁরে, একি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়াছে?" শিষ্যগণ অবাক্ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, একদিনও উনি আহা-রাদি সম্বন্ধে সন্দেহ করেন না, আজও কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না, কাজে কাজেই ওঁর খাওয়া হইয়া যাইবে।" তাঁহারা জানিতেন না যে, রাম-চন্দ্রের [illegible] ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রভাবে তিনি তাঁহাদের চাতুরী বুঝিতে [illegible]ন। [illegible] [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ভোগ হইয়াছে?" শিষ্যগণ সম্মুখে [illegible] [illegible] সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন রামচন্দ্র বলিলেন, "কি! ঠাকুরের ভোগ হয়নি আর আমি খাইব! এইটা তোরা মনে ক'রেছিস্? এ যদি আমি খাই, তবে গোমাংস ভক্ষণ করিব! এই বলিয়া

তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিলেন। তিনি রাত্রে উপবাসী রহিলেন, তথাপি প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই খাইলেন না। তিনি বলিতেন, "ভাল জিনিসটী ঠাকুরকে না দিয়া আমার মুখে উঠে না, আমি কখনও খাইতে পারি না।" ইহাকেই বলে প্রেমাভক্তির 'মমতা'। এই প্রেমাভক্তি কাহার আছে? রামকৃষ্ণদেবের প্রতি রামচন্দ্রের প্রেমাভক্তি ও অটল বিশ্বাসের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে দেখা গিয়াছে। সে সকল ঘটনা যাঁহারা দেখিয়াছেন, সেই পবিত্র জীবন যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই অলৌকিক দেবচরিতের নিকট যাঁহারা সরল বিশ্বাসে শিষ্যের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, রামচন্দ্রের ভক্তি ও বিশ্বাস স্বর্গীয়, অতুলনীয়, অচিন্তনীয়।

রামচন্দ্রকে দেখিয়া আমাদের আর কোন ভক্তজীবন দেখিবার সাধ নাই, আর কোন ত্যাগী মহাপুরুষ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। দেখিলেও, রামচন্দ্রের সহিত কাহার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় না। রামচন্দ্রের ভক্তিতে ও বিশ্বাসে আজ জগত সংসার রামকৃষ্ণ নামে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! রামচন্দ্রের ভক্তিতে ও বিশ্বাসে, বিনা সংস্থানে, আজও পর্য্যন্ত যোগোদ্যানে প্রভুর সেবা উজ্জ্বলরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে! রামচন্দ্রের ভক্তিতে ও বিশ্বাসে লোকে রামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে! রামচন্দ্র তাঁহার ভক্তিতে ও বিশ্বাসে হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া সর্ব্ব প্রথমে জগতের সমক্ষে রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তিতে ও বিশ্বাসেতে বাঁধা ছিলেন। রামকৃষ্ণলোকে রামচন্দ্র দ্বারীস্বরূপ। তিনি যখন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তখন সকলেই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন।

একি সামান্য কথা! যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরে ক্রীড়া করিয়াছেন, যাঁহাকে কলিকাতায় পথে ঘাটে কত সহস্র সহস্র লোক দর্শন করিয়াছে, সেই রাজধানী কলিকাতা সহরের মধ্যস্থলে, রামচন্দ্র সাধারণকে আহ্বান করিয়া "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না" বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার গুরুভাইয়েরা তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন, কত বুঝাইয়াছেন যে, যদি লোকে প্রভুর নিন্দা করে, আমরা শুনিতে পারিব না, কত লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে, কত লোকে কর্ত্তৃত্বাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিছুতেই রামচন্দ্রের মন বিচলিত হইল না! রামচন্দ্র বলিলেন, "যাহা বুঝিয়াছি, সর্ব্বসমক্ষে তাহা

উচ্চৈঃস্বরে বলিব। যে অমূল্য রতন পাইয়াছি, ইহা যে কত সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও কেহ কেহ পান নাই, সেই অমূল্য রতন আজ জনে জনে বিলাইব।" কি বিশ্বাস! কি ভক্তি! তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সমস্ত সদ্‌গুণই তিনি পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তি, রামচন্দ্রের দয়া, রামচন্দ্রের দীনভাব, রামচন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, রামচন্দ্রের তেজস্বিতা, রামচন্দ্রের সহিষ্ণুতা, রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় রামচন্দ্রের নাম প্রবেশ করিয়াছে!

বিশ্বাস ও ভক্তির জোরে যেরূপে রামচন্দ্র শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয় এ স্থানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ সময়ে যখন তিনি হাঁপানি, বহুমূত্র, albumenuria, ইত্যাদি নানা রোগাক্রান্ত হইয়া ভুগিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার জামাতাগণ ও শিষ্যগণ সকলেই যোগোদ্যান হইতে তাঁহার সিমুলীয়ার বাড়ীতে তাঁহাকে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। সকলের অনুরোধে তথায় চিকিৎসার্থ তিনি আসিলেন। ডাক্তার, কবিরাজ অনেকেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কেহই রোগের উপশম করিতে পারিলেন না, তখন রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি বাগানে (যোগোদ্যানে) যাইব। এখানে কি আমি বদ্ধ হইয়া মরিব!" তিনি পূর্ব্বে অনেকবার এই সকল রোগে ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এইবার প্রথম হইতেই তিনি বলিতেন, "এবার বাঁচিব না, এবারে চিকিৎসায় আর কিছু হইবে না, বৃথা কেন তোমরা চেষ্টা করিতেছ?" ক্রমশঃ রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শারীরিক কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি দিবারাত্রের মধ্যে এক দণ্ডও সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু এই কষ্টের সময় তিনি কি করিতেন? দিবারাত্র কেবল রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতেন, আর যাহারা নিকটে থাকিত, তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ নাম করিতে বলিতেন। এইরূপে প্রত্যহই রামকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন হইত। কোন কোন দিন রামচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন, কত উপদেশাদি প্রদান করিতেন, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঠিক যেন রামকৃষ্ণদেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এরূপ ভাবও সময়ে সময়ে দেখাইয়াছেন। একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাচ্চি, যাচ্চি ঠাকুর, আর দেরী নেই!" আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই যে ঠাকুর এসেছেন! দেখ! দেখ! বলরাম খেলা ক'রছে!" এই সময় রামচন্দ্র সকলকেই বলিতেন, "আর আমি এখানে থাকিব না, আমি চলিলাম।" রামচন্দ্র

বিশ্বাস ও ভক্তির বলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহার শরীর ত্যাগ হইবে। তাই শেষে আর বাড়ীতে থাকিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না দিবারাত্র কেবল বলিতেন, "আমায় বাগানে (যোগোদ্যানে) লইয়া চল।"

যোগোদ্যানে আসিলে চিকিৎসা হইবে না, এই ভয়ে কেহই তাঁহাকে যোগোদ্যানে আসিতে দিতে চাহিত না। একদিবস কাহার কথা না শুনিয়া আপনার উঠিবার শক্তি নাই, তথাপি রামচন্দ্র নিজে জোর করিয়া পাল্কী ডাকাইয়া যোগোদ্যানে আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "লোকে মরণকালে গঙ্গাযাত্রা করে, তাই আমি এই স্থানে গঙ্গাযাত্রা করিলাম। আমি কি বাড়ীতে বদ্ধ হইয়া মরিব ? এ সকল কথা যাহারা শুনিয়াছে, এ সকল ঘটনা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে! আর সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে, রামচন্দ্রের কি বিশ্বাস! কি ভক্তি! এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকিলে ডাক্তার কবিরাজের নিষেধ না মানিয়া, আত্মীয়স্বজনের উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, সাংঘাতিক রোগাক্রান্তে দারুণ ও অহরহ হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, চিকিৎসাদির আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, সংসারের মায়ামমতা হৃদয়ে স্থান না দিয়া রামচন্দ্র যোগোদ্যানে আসিলেন। যোগোদ্যানে প্রভুর সমাধি-মন্দির, তাই রামচন্দ্র ইহাকে তীর্থ অপেক্ষাও মহাতীর্থ জ্ঞান করিয়া, মা জাহ্নবীর কূলে গমন না করিয়া, এই স্থানে পুণ্য শরীর ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বলিয়াছি, রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না, রামকৃষ্ণের স্থান ভিন্ন অন্য তীর্থবাস কামনা করিতেন না, তাই শেষে আপন জীবন রামকৃষ্ণ সমাধি-মন্দিরে বিসর্জ্জন দিলেন। এই যে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া, যে কতদূর বিশ্বাসের কথা, তাহা কে বুঝিতে সমর্থ? যিনি আজীবন প্রভু রামকৃষ্ণের সেবায় নিরত ছিলেন, যিনি আপনি রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সেই প্রেমে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, যিনি আপনি প্রভু রামকৃষ্ণের চরণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সকলকে প্রভুপদে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দিলেন, যিনি আপনি বিশ্বাস ও ভক্তির মূর্ত্তিধারণ করিয়া জগৎবাসীকে বিশ্বাস ও ভক্তির বলে মোক্ষ হয়, ইহাই দেখাইলেন, সেই রামকৃষ্ণ-সেবক রামচন্দ্রের চরণে কোটী কোটী নমস্কার। এইরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি যে মহাপুরুষে থাকে, তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল ধন্য, যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশও ধন্য, আর যে সকল মানব এইরূপ মহাপুরুষকে দর্শন করেন, তাঁহারাও ধন্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের দীনভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক রামচন্দ্রের ত্যাগস্বীকার, রামচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তির বিষয় পাঠকগণ কিছু কিছু আভাস পাইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার দীনভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। মহাত্মা রামচন্দ্রকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে রামকৃষ্ণ-সুধামৃত পান করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার চরণে মস্তকমুণ্ডন করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার কৃপায় সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সকলে আজীবন যদ্যপি রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তথাপি তাঁহার গুণের ইয়ত্তা করা যাইবে না। এ অধীন মূর্খ, পামর, কেমন করিয়া সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র রামচন্দ্র-চরিত বর্ণনা করিবে?" এই মূর্খের রামচন্দ্র-চরিত বর্ণনা করিবার আশা, বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার আকাঙ্ক্ষাস্বরূপ। শিব গড়িতে বাঁদর গড়িতে বসিয়াছি, তথাপি শিব গড়িতেই হইবে। কেন যে এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতেছি, তাহাও জানি না। তথাপি না করিলেই নয়। কে যেন অন্তর হইতে বলিতেছে, এখনও চেতন হইতেছে না, আজ চারিবৎসর অতীত হইতে চলিল, রামচন্দ্র দেহ রাখিয়াছেন, কিন্তু কৈ একবারও যে তাঁহার নাম করিতেছ না? একবারও যে বলিতেছ না, যে রামকৃষ্ণ নামে আজ সমগ্র জগতবাসী মাতিয়া উঠিয়াছেন, যে রামকৃষ্ণ-প্রেমে আজ কোটী কোটী নরনারী বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সেই রামকৃষ্ণ নাম কোথা হইতে আসিল? সেই রামকৃষ্ণপ্রেম কে বিতরণ করিয়াছেন? কে যেন দিবানিশি জাগাইতেছে, বলিতেছে, আর ঘুমাইও না, আর ভুলিয়া থাকিও না, বল প্রাণভরে বল, রামচন্দ্রের দয়ায় রামকৃষ্ণের কৃপালাভ হইয়াছে, রামচন্দ্রের দয়ায় রামকৃষ্ণপ্রেমের জুয়ার বহিয়াছে, রামচন্দ্রের দয়ায় রামকৃষ্ণ নামে সর্ব্বসাধারণে মাতিয়া উঠিয়াছে! যাঁহার কৃপায় প্রভুর কৃপা হয়, তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে যে পুণ্যের সঞ্চার হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যে দিন রামচন্দ্রচরিতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ করি, সেই দিন সুদিন বলিয়া গণনা করি। তাই রামচন্দ্রচরিত কিছু কিছু পাঠকগণকে জানাইতে চেষ্টা করিতেছি।

ধার্ম্মিকের দীনতা একটী মহৎ গুণ। যিনি ধর্ম্মপথে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই তাঁহার দীনভাব বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দীনভাব দেখিয়া অতি পাষণ্ডেরও অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হইয়াছে। এই দীনতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন! দীনহীন কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াই ঠাকুর এবার গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন। এমন কোন মনুষ্য নাই, যিনি ঠাকুরের দীনভাব দেখিয়া না আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এমন কি, যাঁহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারাও তাঁহার দীনভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে দন্ত দ্বারা মার্জ্জনী ধারণ করিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন জগতে জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রে দীনভাব কত পরিমাণে ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রামচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট কেমিক্যাল একজামিনার ছিলেন। সুতরাং লৌকিক হিসাবে তাঁহার মান্যও বিশেষ ছিল। তিনি নিজ বিদ্যাবলে যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে, মেডিক্যাল কলেজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে এবং অন্যান্য কারণেও সহরের অনেক ধনী মানীর সহিত তাঁহার আলাপ ও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কার্য্যবশতঃ অনেক সময় তাঁহাদের নিকট তাঁহাকে যাইতে হইত। রামচন্দ্র নিজেও ধনী, কিন্তু তিনি কিরূপ বেশে তাঁহাদের নিকট যাইতেন? অনেকেই জানেন যে, কর্ম্মস্থল ভিন্ন রামচন্দ্র একখানি থানকাপড় ও এক লংক্লথের চাদর ভিন্ন অন্য কোনও বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, যাঁহার সহিতই রামচন্দ্র সাক্ষাৎ করিতে যাউন না কেন, তাঁহার বেশের মধ্যে সেই থানকাপড় ও সেই চাদর। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এইটী হয়ত তাঁহার ধর্ম্মের ভান ছিল। কিন্তু তাহা মনে করা ভুল। কেন না, রামচন্দ্র যখন তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী যাইতেন, তখনও তাঁহার বেশের পরিবর্ত্তন কেহ দেখেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ কুটুম্বই বড়লোক। সময়ে সময়ে যখন তাঁহাদের বাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে শত শত গণ্যমান্য ধনী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রামচন্দ্রও গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহারা অভ্যর্থনা করিতেন, নতুবা অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, কত বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ

করেন নাই কেন? তাঁহার ত কিছুই অভাব ছিল না। যিনি শত শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তিনি কি আর ইচ্ছা করিলে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিতে পারিতেন না? তিনি কি আর ইচ্ছা করিলে ধনীসমাজের উপযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে মান লইতে পারিতেন না? তিনি কি আর ইচ্ছা করিলে বাবু সাজিয়া কুটুম্বের ভ্রূভঙ্গী রোধ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সম্মান লইতেন পারিতেন না? কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই কেন? তিনি জানিতেন যে, তাঁহার প্রভু রামকৃষ্ণ দীনহীন পূজারির বেশে আগমন করিয়াছেন, আর তিনি কেমন করিয়া রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিবেন? তাঁহার প্রভুর কাঙ্গাল বেশ, আর তাঁহার কেমন করিয়া রাজবেশ হইতে পারে? তিনি যাঁহার দাস, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে, আর নিজে কেমন করিয়া সুন্দর বেশভূষা করিবেন? যাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন, যাঁহাকে জীবনের একমাত্র সহায় ও সম্বল জানিয়া সার করিয়াছেন, যাঁহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তন জানিয়াছেন, তিনি যখন সামান্য বেশে, তখন রামচন্দ্র কেমন করিয়া বহুমূল্য বসনাদি পরিধান করিবেন? তাই তিনি সামান্য বেশ সার করিয়াছিলেন। একেই না বলে দীনভাব! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিবার শক্তি সত্বেও রামচন্দ্র যেরূপ বেশে শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিলেই রামচন্দ্রের দীনতার কথা মনে পড়ে।

এক দিবস যোগোদ্যানের ঠাকুরের ভোগের জন্য আতপ চাউল ক্রয় করিতে রামচন্দ্র জনৈক শিষ্য সমভিব্যাহারে বড়বাজারে গিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি ও অতুলনীয় রূপ দেখিয়া কে না মনে করিবে যে, তিনি কোন উচ্চ বংশসম্ভূত ধনীপুত্র। বড়বাজারের চাউলপটীর দোকান-দারগণ আপন আপন উৎকৃষ্ট চাউল দেখাইতেছে, রামচন্দ্রও দেখিতেছেন। এমন সময় একজন বলিল, "মহাশয়! আমার দোকানে আসুন, এমন চাউল আর নাই। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে এমন চাউল কেহই খাওয়ায় না।" পাঠকগণণ! শ্রাদ্ধ বাড়ী বলিবার হেতু কি বুঝিতে পারিয়াছেন ত? রামচন্দ্রের বেশ দেখিয়া তাহারা মনে করিয়াছে যে, অবশ্যই ইহাঁর কোন গুরুজনের মৃত্যু' ঘটিয়াছে, নতুবা এমন বড়লোক এরূপ বেশে আসিবেন কেন? (রামচন্দ্র গাড়ীর ভিতরে ছিলেন, তাহারা তাঁহার চটীজুতা দেখিতে পায় নাই।) পরিধানে থানকাপড় ও এক চাদর, আবার তিনি আতপ চাউল কিনিতে

আসিয়াছেন, তাহারা সহজেই মনে করিয়াছে যে, এর বাড়ী শ্রাদ্ধ হইবে। তাঁহাদের দোষ কি? দেশ কাল পাত্র হিসাবে যেরূপ আচার ব্যবহার, চালচলন দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপই মনে করিয়াছে। আজকাল এরূপ বেশে কোন সামান্য লোককেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার [illegible] আসিয়াছেন, অবশ্যই বড়লোক হইবেন, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, এরূপ বেশেও ইনি বাহিরে আসিয়া থাকেন। তাহারা কেমন করিয়া জানিবে যে, এই বেশ ভিন্ন রামচন্দ্র কখনও কোন উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন না? তাই বলিতেছি, ইহা কি রামচন্দ্রের দীনতা নহে? ইহাতেও কি রামচন্দ্রের অভিমানশূন্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না?

এক্ষণে দেখা যাউক, রামচন্দ্র কর্ম্মস্থলে কিরূপ বেশে যাইতেন। রামচন্দ্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং মিলিটারি ছাত্রগণের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সুতরাং এ স্থলে অন্ততঃ এ স্থানের উপযুক্ত উত্তম বেশাদি পরিধান করিতে অনেকেই আশা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা যেরূপ ছিল, তাহা আরও বিস্ময়জনক। এক ছেঁড়া কতকেলে পেণ্টুলেন, এক সূতার বোতাম দেওয়া কামিজ ও এক সাদা ঝল্‌ঝলে কোট। ইহা দেখিলে কাহার মনে হইবে যে, ইনি অধ্যাপক! আজকাল সেরূপ পেণ্টুলেন ও সেরূপ কোট পরিধান করিতে একজন দশটাকা বেতনের কর্ম্মচারীকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন সামান্য লোকও সেই বেশে আসিতে লজ্জা বোধ করেন, পাছে কেহ জাহাজের খালাসী বলে। কিন্তু রামচন্দ্রের কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে কি মনে হয়? যিনি মাসে প্রায় সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন, কর্ম্মস্থলে যাঁহার কত সম্মান, কত উচ্চপদ, তিনি কেমন করিয়া এই বেশে কর্ম্মস্থলে আসিতেন? ইহাতেই মনে হয় যে, রামচন্দ্রের ন্যায় দীনভাবে জীবনযাপন করিতে অতি অল্পই দেখা যায়। অর্থ থাকিলেই বিলাসিতা আগে আসিয়া উপস্থিত হয়, অর্থ থাকিলেই উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে ইচ্ছা হয়। অর্থ থাকিলেই সুগন্ধ তৈলাদি মাখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু রামচন্দ্রে কেহ কখনও কোন বিলাসিতার ভাব দেখিয়াছেন কি? বিশেষ আবশ্যক না হইলে রামচন্দ্র কখনও মস্তকে চিরুনি পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? ইহাতেও কি রামচন্দ্রের দীনভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইহাতেই কি বুঝা যাইতেছে না যে, রামচন্দ্রের বেশভূষায় লক্ষ্য ছিল না? ইহাতেই কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না যে,

রামচন্দ্র উচ্চ ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, সুতরাং শরীরের সৌন্দর্য্যের দিকে আদৌ তাঁহার মন ছিল না?

রামচন্দ্র শেষজীবনে যখন যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি কিরূপ দীনভাবে জীবনযাপন করিতেন। যোগোদ্যানে তিনি পাঁচ হাতী কাপড় (যাহা টাকায় চারিখানা) পরিধান করিয়া থাকিতেন। তিনি নিজে প্রভুর সেবা করিতেন। এমন কি কত সময় আপনি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন। তাঁহার শেষ জীবনের কয়েক বৎসর তিনি ইচ্ছা করিয়া আর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন না, আপনিই রন্ধন করিতেন। যিনি ইচ্ছা করিলে একটী কেন, চার পাঁচটী বেতনভোগী ব্রাহ্মণ রাখিয়া প্রভুর সেবা করাইতে পারিতেন, তিনি নিজে রন্ধন করিয়া প্রভুর সেবা করিতেন কেন? ইহাই তাঁহার নিকট বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ ছিল, তাই শরীরের কষ্টের দিকে, মান সম্ভ্রমের দিকে, তিনি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তিনি প্রভুর দাস, নফরের কাজ প্রভুসেবা, তাহাতে আবার মান অপমান কি? রামচন্দ্র প্রভুর জন্য না পারিতেন, এমন কাজই নাই। প্রভুর নাম লইয়া নগ্নপদে রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্ত্তন করিতেও তিনি লজ্জিত হইতেন না।

অনেকেই দেখিয়াছেন, জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়া হইতে সেবকমণ্ডলী সমবেত করিয়া রামচন্দ্র কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগোদ্যানে আসিতেন। রাস্তায় কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেন, কোন কোন বৎসর অজস্র বারিধার পড়িতেছে, কেহ কেহ ছাতা মাথায় দিয়াছেন, কেহ কেহ সময় সময় বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইতেছেন, কাহার কাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, খোল করতাল সময় সময় বন্ধ হইতেছে, কীর্ত্তন প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, তথাপি রাম-চন্দ্রের বিরাম নাই! তিনি আপন উচ্চকণ্ঠে প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে গাহিতেছেন। বারিধারায় বস্ত্রাদি ভিজিয়া গিয়া থব্ থব্ করিতেছে, আর তাঁহার অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! তাঁহার সেই অদ্ভুত দীনতা ও অভাবনীয় অতুলনীয় ভক্তির জোরে পুনরায় একে একে সকলে যোগদান করিলেন, পুনরায় খোল করতাল বাজিয়া উঠিল, আবার কীর্ত্তন জমিয়া যাইল। রামচন্দ্রের সেই দিনকার ভাব দেখিয়া কত ঘোর নাস্তিক পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছে! অনেকেই চিন্তান্বিত হইয়াছেন, "আহা! এমন সুপুরুষ, এমন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, রাস্তায় ভয়ানক বর্ষায়

ভিজিয়া, ভিজিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন! কি ভক্তি! কি দীনতা! এইরূপ দীনভাব না থাকিলে কি ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়?" সেই দিনের ঘটনা দেখিয়া কত লোকের জীবন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! কত লোকের হৃদয়ে ভক্তি আসিয়াছে, কত লোকের অহংনাশ বিদূরিত হইয়া দীনভাব স্থান আসিয়া হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে! বাস্তবিক হইবারই কথা! ভাবিয়া দেখিলে শরীর কম্পিত হইয়া উঠে! যাঁহার শরীর নানা রোগাক্রান্ত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অশ্বযান ব্যতীত যাঁহার আর পথভ্রমণ করিবার শক্তি নাই, পাদুকা ভিন্ন যাঁহার চলিবার অভ্যাস নাই, যাঁহার কোমল শরীরে অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই শয্যাগত হইতে বাধ্য হইতেন, যাঁহার প্রত্যহ গরম জল ভিন্ন ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে সহ্য হইত না, সেই রামচন্দ্র পদব্রজে, নগ্নপদে, বর্ষায় ভিজিতে ভিজিতে তিন মাইল রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন! আপনার শরীর বহিতেছে না, বহুবিধ রোগাক্রান্ত হইয়াও, কর্ম্মস্থলে কর্ম্মাদি করিয়াও যিনি প্রভুর প্রচার উপলক্ষে মাসে মাসে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন, যিনি আপনি প্রভুর সেবাকার্য্য করিয়াছেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতেছে, শরীরে সহ্য হইতেছে না, তথাপি যিনি প্রভুর সেবার জন্য রন্ধনকার্য্যে একজন ব্রাহ্মণ রাখিয়া বা শিষ্যগণের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, যিনি বহু অর্থের অধিকারী হইয়া অসুস্থ হইলেও সিমুলিয়ার আপন বাটী পরিত্যাগ করিয়া যোগোদ্যানে থাকিতেন; যাঁহার যোগোদ্যানের জলবায়ুতে যে সকল রোগে তিনি ভুগিতেছিলেন, সেই সকল রোগের উপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তথাপি যিনি প্রভুর স্থান বলিয়া যোগোদ্যান পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া আপন জীবন প্রভুর চরণে বলিদান করিলেন; তবুও কি সেই রামচন্দ্রের দীনভাবের পরাকাষ্ঠার বিষয় বুঝা যাইতেছে না? ইহাতেও কি বলিবে না যে, রামচন্দ্র অহংনাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? ইহা জানিয়াও, ইহা দেখিয়াও কোন্ পাষণ্ড তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিতে সাহসী হইবে? কোন্ পাষণ্ড সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক রটনা করিয়া আপন পাপের বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিবে?

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্র যখন শিষ্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গুরুগিরির ভাব আসিয়াছিল, নতুবা দীনভাব থাকিলে গুরু হইতে পারিতেন না। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। কেন না, যে কারণে তিনি শিষ্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। কাশীপুরের বাগানে যখন ভক্তদের

দিন যে সময় প্রভু কল্পতরু হইয়া "তোমাদের চৈতন্য হউক" বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একে একে সকলের বুকে হাত দিতে লাগিলেন, তখন রামচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "আহা! এমন সুদিন কি আর হইবে? আজ প্রভু কল্পতরু হইয়াছেন, যাহাকে স্পর্শ করিবেন, সেই কৃতার্থ হইবে ও মুক্তিলাভ করিবে।" এই ভাবিয়া রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাদের সকলকে কৃপা করিলেন, তখন তিনি রাস্তায় আসিয়া যাহাকে পাইয়াছেন, তাহারই হস্ত ধরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়াছেন এবং তাহাকে কৃতার্থ করাইয়াছেন। রামচন্দ্র জানিতেন যে, ঠাকুর এখনও কল্পতরু, তাই তিনি কাহার কাহার হাত ধরিয়া যোগোদ্যানে প্রভুর নিকটে লইয়া গিয়াছেন ও ঠাকুরের সম্মুখে বলিয়াছেন, "প্রভু! এই আবার এখন একজনকে ধরিয়া আনিয়াছি, আপনি ইহাকে দয়া করুন।" এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন ও শিষ্য করিয়াছেন। পাঠকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহাকে কি গুরুগিরি বলে? ইহাতে কি রামচন্দ্রের অভিমানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? না, আরও দীনভাবের দৃষ্টান্তের পোষকতা করিতেছে?

রামচন্দ্র উপদেশ দিয়াছেন, শিষ্য করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে "আমি গুরু" এ ভাব আসে নাই। তাহা না হইলে তিনি শিষ্যগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার কয়েক জন শিষ্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যোগোদ্যানে তাঁহার নিকটই বাস করিতেন। ইহাদের তিনি প্রভুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন। সময় সময় তাহাদের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিশ্রম হওয়ায় শারীরিক কষ্ট হইয়াছে। রামচন্দ্র যখনই বুঝিতেন যে, ইহার কষ্ট হইয়াছে, অমনি নিজে তাহাকে ডাকিয়া সম্মুখে বসাইতেন এবং তাহার পদসেবা করিতেন। শিষ্য কেমন করিয়া ইহা সহ্য করিবে? সঙ্কুচিত হইয়া পদ সরাইয়া লইলে রামচন্দ্র বিরক্ত হইতেন, আর বলিতেন, ইহাতে তোমার অমঙ্গল হইবে না। তোমার কষ্ট হইয়াছে, আমার ইচ্ছা আমি 'পা টিপিয়া দিব?' শিষ্য উত্তর করিতেন, "না, আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই, আপনি এরূপ করিবেন না।" রামচন্দ্র শুনিতেন না, শেষে জোর করিয়া তাহার পদসেবা করিতেন। বুঝুন দেখি, যিনি গুরু, তিনি শিষ্যের পদসেবা করিতেছেন! কোথায় গুরু হইয়া শিষ্যগণ দ্বারা কেবল পদসেবা করাইবেন, না তাহাদের পদসেবা করিতেছেন! ইহা

কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন না শুনিয়াছেন? ইহাকে কি গুরুগিরি বলে? আবার, যে শিষ্য অধিকাংশ দিবস রামচন্দ্রের স্নানের সময় তাঁহাকে তৈল মর্দ্দন করাইয়া দিত, তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। শিষ্য তৈল মর্দ্দন করাইতে আসিলে, রামচন্দ্র প্রথমে কিছুই বলিতেন না। যেমন তাহার কার্য্য শেষ হইল, অমনি তিনি তাহাকে ধরিলেন, নিজে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তাহারও সর্ব্বশরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় রামচন্দ্র কতদূর দীনতার পরিচয় দিয়াছেন! তাঁহার আদৌ বোধ নাই যে তিনি গুরু, আর যাহার সেবা করিতেছেন, সে তাঁহার শিষ্য। আপনাকে দীনহীন কাঙ্গাল বোধ না করিলে শিষ্যের সেবা করিতে পারিতেন না। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র গুরুগিরির জন্য শিষ্য করেন নাই।

রামচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা করিলে, রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী বুঝিতে চেষ্টা করিলে, স্পষ্টই দেখা যায় যে, তাঁহার অহঙ্কার ছিল না! রামচন্দ্র রামকৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং আর তাঁহার অহঙ্কার থাকিবে কেমন করিয়া? তিনি আপনার ভাব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যোগোদ্যানে বাসকালীন তাঁহার প্রত্যেক দিনের ঘটনায় দীনভাবের কত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে! কতদিন তিনি নিজে বাগান কোপাইতেন, নিজেই শাক সবজী করিতেন। তিনি বলিতেন, তিনি প্রভুর গোলাম। তাই গোলামী করিতে কখনও লজ্জিত হয়েন নাই।

যোগোদ্যানে রামচন্দ্র কিরূপ দীনভাবে বাস করিতেন, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত এ স্থানে উল্লিখিত হইতেছে। যদিও রামচন্দ্র যোগোদ্যানে প্রভুর সেবার সমস্ত কার্য্যের ভার আপনিই লইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার একজন শিষ্যকে যোগোদ্যানের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রভুর সেবাকার্য্যে যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা সেই তত্ত্বাবধান করিবে ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সময়মত আনাইয়া লইবে। এক দিবস মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী নামক রামচন্দ্রের জনৈক বন্ধু কাঁকুড়গাছী অঞ্চলে বাগান ক্রয় করিবার মানসে যোগোদ্যানে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। যোগোদ্যানের বাতাবী নেবু অতি উৎকৃষ্ট। নেবু গাছে অনেকগুলি নেবু পরিপক্ক অবস্থায় ছিল। রামচন্দ্র একটী নেবু বিহারীবাবুকে দিবার মানস করিলেন।

অমনি সেই কার্য্যাধ্যক্ষ শিষ্যের নিকট আসিয়া কত বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীবাবুকে একটী নেবু দোবো কি?" তাঁহার সেই বিনয়ের ভাব দেখিয়া শিষ্য অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন এবং ক্ষণেক পরে বলিলেন, "আপনি এরূপ করিলে আমাদের বড় লজ্জা হয়!" রামচন্দ্র বলিলেন, "এই বাগান ঠাকুরের। তুমি ঠাকুরের কার্য্যাধ্যক্ষ। তোমার অনুমতি বিনা কেমন করিয়া দিব?" শিষ্য কহিলেন, "যখন আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্য দিবেন।" তৎপরে রামচন্দ্র একটী নেবু বিহারীবাবুকে দিলেন। এই ঘটনা দেখিলে কি বোধ হয়? যিনি ঠাকুরের সেবকমণ্ডলীর অগ্রণী, যিনি বাগানের একমাত্র অধিকারী, তিনি তাঁহার শিষ্যের নিকট একটী বাতাবী নেবুর জন্য দীনহীন ভিখারীর মত ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বোধ নাই যে, তিনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা কেন, সমস্ত বাগানই যে তাঁহার, যাহার নিকট চাহিতেছেন, সেও যে তাঁহারই ভৃত্য! ইহাতেও কি বলিতে পার যে, রামচন্দ্র অহঙ্কারী ছিলেন? তবুও কি বলিবে না যে, রামচন্দ্র আপনাকে দীনহীন জ্ঞান করিয়া দীনভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন? ভাবিয়া দেখুন! গুরু আপন দ্রব্য আপনার শিষ্যের নিকট হইতে কত দীনভাবে কত সঙ্কুচিতভাবে চাহিতেছেন, যেন কত কি অপরাধ করিয়াছেন! ইহা অপেক্ষা দীনভাবের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? তাই বলি, যেমন প্রভু রামকৃষ্ণ দীনাবতার, তেমনি তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র দীনভাবে গঠিত!

রামচন্দ্রলিখিত প্রভুর জীবনবৃত্তান্ত, তত্ত্ব-প্রকাশিকা এবং প্রভুর উপদেশ অবলম্বনে রামচন্দ্রের বক্তৃতাদি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামচন্দ্র অনেক স্থলে আপনার জীবনের ঘটনাবলী আপনি বর্ণনা করিয়াছেন। যে ভাবে আপন জীবন লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঠিক মনে হয়, যেন তিনি কত পাষণ্ড, বর্ব্বর নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাল্য জীবন হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তিনি কখনও কোনও পাপ কার্য্যের লেশমাত্রও করেন নাই। মিথ্যা কথা, জুয়াচুরী বা পাপ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি চিরদিন সত্যের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সত্যের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি চিরদিন এরূপ পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন যে, কোন মানব তাঁহার কোনও দোষ দর্শাইতে পারেন না; তথাপি তিনি যে আপনাকে পাষণ্ড, বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার

দীনতার পরিচয় মাত্র। তাই বলি, রামচন্দ্র যথার্থ আপনাকে দীনহীন জ্ঞান করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র প্রভু রামকৃষ্ণের চিরসঙ্গী হইয়াও আপনাকে রামকৃষ্ণভক্তের গোলাম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যে কেহ কাঁকুড়গাছীতে প্রভুর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক জয় রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অমনি রামচন্দ্রের মন কাড়িয়া লইয়াছেন। কিছুদিন যাতায়াত করিলেই রামচন্দ্র তাহার দাসের মত সেবা করিতেন। তাহার যখন যাহা আবশ্যক, তখনই তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার সেও সময় সময় রামচন্দ্রের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছে! এমন কি, রামচন্দ্রের সাংসারিক ব্যয়াদি সম্বন্ধেও কর্তৃত্ব করিতে ছাড়ে নাই।

কোন সময় যোগোদ্যানের এক ভৃত্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপর বিশেষ ভক্তি দেখাইয়া রামচন্দ্রের মন এত দূর অধিকার করিয়াছিল যে, সে তাঁহার সংসারে কর্তৃত্ব করিলেও তিনি কিছুই বলিতেন না। সেই পাষণ্ডের কর্তৃত্বে রামচন্দ্রের পরিবারবর্গ কত সময় আহারাদি সম্বন্ধে কত কষ্ট পাইয়াছেন! এমন কি, কত কাল বাড়ীতে ময়দা না আনাইয়া ভুষির আটা খাওয়াইয়া রামচন্দ্রের স্নেহের পুত্তলিদিগকে রক্ত আমাশয়ে ভোগাইয়াছে, তথাপি রামচন্দ্র কিছুই বলেন নাই! তিনি জানিতেন যে, সে রামকৃষ্ণ-দাস, আর তাহার উপর কথা নাই। আহা! অদ্ভুত ভক্তি! অদ্ভুত দীনতা! অদ্ভুত অহং-নাশের দৃষ্টান্ত! এ সকল ঘটনা এই ঘোর কলিকালে গল্পকথা বলিয়া মনে হয়! কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, 'কে অস্বীকার করিবে?

রামচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া যেরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়জনক। তিনি চিরদিন ভক্তের সেবা, ভক্তের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন এবং শেষ সময়েও সেই ভাবের কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার শেষ সময়ে তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি মরিয়া যাইলে, তোরা আমার চারটী ভস্ম আনিয়া ফটকে পুঁতিয়া রাখিস্। যে কেহ এখানে (যোগোদ্যানে) প্রবেশ করিবে, সেই আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে চিরদিন আমি ভক্ত-পদধূলি পাইব।" আহা! কি দীনতার কথাই বলিয়াছেন! কি দীনভাবের পরিচয়ই দেখাইয়াছেন! আজীবন কাঙ্গালের মত থাকিয়াও, আজীবন ভক্ত-সেবা করিয়াও, আজীবন ভক্তের পদধূলি লইয়াও, রামচন্দ্র দীনভাবের আকাঙ্ক্ষা

হইল না বুঝিয়া, চিরদিন ভক্তপদরজ পাইবার আশায় এই ব্যবস্থা করিতে বলিলেন! তাই বলি, ধন্য রামচন্দ্র! ধন্য তোমার দীনতা! তুমিই যথার্থ দীনাবতার রামকৃষ্ণকে চিনিয়াছিলে! তাহা না হইলে কোথায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া রাজরাজেশ্বরের ন্যায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবে, না—দীন ভিখারীর মত কাঙ্গালবেশে জঙ্গলে থাকিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনবিহীন হইয়া আপনার জীবনান্ত করিয়াও, পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, চিরদিন ভক্তপদতলে লুটাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে! ইহা দেখিয়াই, ইহা জানিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে, যেমন প্রভু রামকৃষ্ণ দীনতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র দীনহীনের মত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের দয়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক রামচন্দ্রের বিষয় আমরা গত বর্ষ হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় রামচন্দ্রের জীবন যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাঠকগণ পাইয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে যে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব চলিয়া গিয়া দেবত্ব আসিয়া অধিকার করে, রামচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রামচন্দ্রের শেষ জীবনে আমরা তাঁহার দেবভাব যেরূপ দেখিয়াছি, অশেষ গুণরাশির আকরস্বরূপ তাঁহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের নিকট কিছু বলিতে প্রয়াস পাইতেছি। রামচন্দ্র সদ্‌গুণাবলীর আকরস্বরূপ ছিলেন। এমন কোন সদ্‌গুণ নাই, যাহা রামচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখনই যে কোন সদ্‌গুণের কথা মানসে উদিত হইয়া থাকে, তাহাই রামচন্দ্রে দেখিয়াছি বলিয়া তখনই স্মরণ হইয়া থাকে। দয়া, ক্ষমা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, দীনতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণই রামচন্দ্রে ছিল। এই প্রবন্ধে রামচন্দ্রের দয়া ও পরদুঃখকাতরতা

সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। যদ্যপি তাঁহার ইচ্ছা হয়, পরে অন্যান্য বিষয়ও লিখিত হইতে পারে।

রামচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে শেষজীবন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের জানা নাই। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার শেষ জীবনের কয়েক বৎসর আমরা তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার পবিত্র জীবনের অলৌকিক ঘটনা সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার জীবন সর্ব্বগুণের আকর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাই তাঁহার জীবনের পূর্ব্বভাগের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা অতি সামান্য। সে যাহা হউক, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, কয়েক বৎসর তাঁহার চরণতলে অবস্থিতি করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের নিকট বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। যখনই রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করি, যখনই তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করি, তখনই তাঁহার যে বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া মনে করি, তাহাই আপনি আসিয়া উদিত হয়। রামচন্দ্রের দয়ার কথা অধিক আর কি বলিব, রামচন্দ্র দয়ার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন।

শুনিয়াছি যে, রামচন্দ্রের বাল্যজীবন অতি কষ্টকর ছিল। যখন তাঁহার বাল্যজীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি বলিতেন যে, "সে তোমাদের শুনে কাজ নাই, সে অত্যন্ত কষ্টে গিয়াছে।" বাস্তবিক তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার শেষ জীবনে দেখিয়াছি। তিনি কাহারও দুঃখ দেখিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন এবং নিজে অনুভব করিয়াছিলেন যে, দুঃখে জীবনযাপন করা কি ভয়ানক কষ্টকর। তাই কাহারও কষ্ট দেখিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। কাহারও দুঃখের কাহিনী শুনিলে তাঁহার চক্ষে জল আসিত ও কেমন করিয়া তাহার দুঃখ দূর হইবে, সেই বিষয় তিনি চিন্তা করিতেন। এমন কি, যাঁহারা রামচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহাদের দুঃখের সময় রামচন্দ্র যেরূপ অন্তরের সহিত দুঃখিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের পরম আত্মীয়ের নিকট হইতেও তাহার একবিন্দুও প্রাপ্ত হয়েন নাই। জানি না কি কারণে কয়েকটী ব্যক্তি রামচন্দ্রের উপর বিরূপ ছিলেন (এখন আর সেরূপ ভাব কাহারও নাই)। ইহাদের মধ্যে দুইজন দুই সময় যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় রামচন্দ্রের দয়ার তাঁহাদের কতদূর উপকার হইয়াছিল, তাহাই

বলিতেছি। দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ সময়ে সংসার প্রতিপালনের উপায়-স্বরূপ কর্ম্মস্থলে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়াছিল। দুই জনেরই সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। যাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়া তাঁহাদের নিকট বিবেচিত হইত, যাঁহাদের তাঁহারা বিপদের বন্ধু বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের সকলের নিকটেই বিপদের কথা জানাইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। তাঁহারা আদৌ মনে করেন নাই যে, রামচন্দ্রের নিকট তাঁহাদের বিপদের কথা জানাইবেন, কেননা তাঁহারা রামচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেন, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া তাঁহারা আশাই করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুই জনেরই হঠাৎ তাঁহাদের বিপদের সময় রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রামচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুহাস্যে তাঁহাদের মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মলিন বদন দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে! দুই জনেই যথা সময়ে তাঁহাদের দুঃখের সংবাদ প্রদান করেন! তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের মনে তাঁহাদের জন্য আঘাত লাগিল। তিনি তাঁহাদের জন্য চিন্তিত হইয়া সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মাসে মাসে সংসার চলে, তাহার মত ব্যবস্থা ঠাকুর করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে মাসে মাসে সেইরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য জানাইয়াছিলেন। দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র এমনি দয়ার্দ্রহৃদ ছিলেন যে, কেহ তাঁহার নিকট কোন দুঃখ জানাইলে বা সাহায্য চাহিলে, সাহায্য না পাইয়া মলিন বদনে ফিরিতেন না। দুঃখ জানাইলেই রামচন্দ্র তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। আমরা তাঁহার শেষ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক সময় প্রচার হইল যে, রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া দুঃখ জানাইলে বিনা সাহায্যে কেহ ফিরিয়া আসেন না। সেই সময় দিন কতক দেখিয়াছিলাম যে, প্রায়ই এক এক জন লোক পিতৃ মাতৃ দায় উপস্থিত বলিয়া 'কাছা' গলায় দিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইত! রামচন্দ্র ইহা সত্য ঘটনা বিবেচনায় প্রথমে প্রত্যেককেই দুই টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ লোক সংখ্যা অধিক হওয়ায় একটী করিয়া টাকা তৎপরে আট আনা মাত্র দিতেন। অনেকেই ইহা অর্থ

উপার্জ্জনের সুবিধা বিবেচনা করিয়া কাছা গলায় দিয়া রামচন্দ্রের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ লইয়া যাইতেন। ক্রমে রামচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তৎপরে তাহাদের যথার্থ প্রয়োজন কি না তাহা জানিয়া দান করিতেন।

রামচন্দ্রের শেষ সময়ে তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তৎসমস্তই তাঁহার সংসারের খরচ ও যোগোদ্যানে ঠাকুরের সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হইত, মেডিক্যাল কলেজে মাসিক বেতন দুই শত টাকা যাহা পাইতেন, তাহা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিঃশেষে খরচ হইয়া যাইত। যোগোদ্যানের বার্ষিক মহোৎসবে যে খরচাদি হইত, তাহাতে রামচন্দ্র ঋণগ্রস্থ হইতেন; তাহার ব্যয়াদি সংকুলান করিবার জন্য রামচন্দ্র মাসে মাসে তাঁহার বেতন হইতে কিছু কিছু ঋণ পরিশোধ করিতেন; সুতরাং মাসিক বেতন পাইবামাত্র মহোৎসবের ঋণ পরিশোধ এবং যোগোদ্যানের ও তাঁহার বাড়ীর ভৃত্য ব্রাহ্মণাদির বেতনে ও গাড়ী ঘোড়া, কোচম্যান সহিসাদির বেতনাদিতে সমস্তই ব্যয় হইত। ঠাকুরের সেবা ও তাঁহার সংসারের খরচের জন্য যাহা তিনি প্রত্যহ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই নির্ব্বাহ হইত। যথা কেরোসিন পরীক্ষা, জল পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা ইত্যাদি। এই সকল রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া যাহা তিনি উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই নিত্য ঠাকুরসেবা ও সংসারের খরচাদি হইত। তাঁহার শেষ জীবনে কর্ম্মস্থলে এই সকল পরীক্ষার আয় অধিকাংশই কমিয়া গিয়াছিল, কেন না কোম্পানি হইতে এই সকলের পারিশ্রমিক ব্যয় কমাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং, যৎসামান্য যাহা পাইতেন, তাহাতে এক প্রকারে চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার যেরূপ দান ছিল, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। একদিন ঠাকুরের কোন একটী ভক্তের পুত্র আসিয়া রামচন্দ্রকে তাঁহাদের সংসারের দুঃখের বিষয় জানাইয়াছিল। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'মণি-ম্যাগ' হইতে ছয়টী টাকা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই কয়েকটী টাকা ব্যতীত আর তাঁহার নিকট কিছুই ছিল না। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, "আপনি কি করিলেন? এখানে (যোগোদ্যানে) ঠাকুরের চাউল ইত্যাদি আনিতে হইবে, আবার বাড়ীতেও এই সময় খরচ কিছু দিতে হইবে. আর ঐ বালক যথার্থ তাঁহার (সেই ভক্তের) পুত্র কি না আপনি জানেন না, পরিচিত নহে, তথাপি আপনি কেমন করিয়া ইহাকে যাহা ছিল, সমস্তই দান

করিলেন ?" রামচন্দ্র বলিলেন, "কি করিব ? যদ্যপি এই বালক যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য হয় যে, ও সেই ভক্তের পুত্র এবং উঁহাদের আজ হাঁড়ি চড়াইবার কোন উপায় নাই, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, আজ উহাদের কি কষ্টের দিন! ইহা ভাবিয়া আর আমি স্থির হইতে পারিলাম না। কাহারও কষ্ট শুনিলে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে, ঠাকুর ইহার দুঃখ নিবারণ করুন, ইহা মনে করিয়া আমার নিকট যাহা ছিল, তাহাই দিয়াছি, তুমি কি মনে কর যে, ইহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে ? তাহা নহে। তবে আমার নিকট যাহা ছিল তাঁহা দিয়াছি, আর যাহা করিতে হয়, ঠাকুর করিবেন। আর বাড়ীর ও এখানকার খরচ আজ নাই বলিতেছ ? যিনি এই সকল খরচ যোগাইয়া থাকেন, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

রামচন্দ্রের পরদুঃখে কাতরতা ও দয়ার পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে ? যিনি লক্ষপতি, তিনি অনায়াসে দুই সহস্র দান করিতে পারেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ন্যায় অবস্থায় পতিত হইয়া এইরূপ দান করা অলৌকিক। শরীর দয়ায় গঠিত না হইলে, এরূপ কার্য্য করা অসম্ভব। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যাইত। কোন সময়ে কেহ বা কন্যা-দায়গ্রস্থ, কেহ বা ঋণগ্রস্থ, কেহ বা পিতৃ মাতৃ দায়গ্রস্থ, কত লোক এইরূপে রামচন্দ্রের নিকট তাঁহাদের দুঃখ জানাইতে আসিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখনই যে কেহ আসিয়াছেন, পরিচিত হউন, অপরিচিত হউন, ভক্ত হউন, অভক্তই হউন, ভদ্রলোক হউন, দীন দরিদ্র কাঙ্গালই হউন, রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাহা থাকিত, তাহা সমস্তই দান করিতেন, কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না, বা তাঁহার নিজের অন্যান্য খরচাদি কিরূপে হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতেন না।

রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী অলৌকিক। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন! এইরূপ ঘটনা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইব, কেহ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন। রামচন্দ্র এরূপ দয়ার্দ্রহৃদয় ছিলেন যে, দুঃখ শুনিলে আর তিনি বিচার করিতে পারিতেন না। পরদুঃখে রাম-চন্দ্রকে যেরূপ কাতর দেখিয়াছি, এরূপ আর দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রামচন্দ্রের দ্বারা যে কত মানবের কত প্রকারে উপকার হইত, তাহা কেমন করিয়া জানাইব ? কাহারও বিদ্যোপার্জ্জন করিবার ইচ্ছাসত্ত্বে

অভাববশতঃ তাঁহা হইতেছে না, জানিতে পারিলেই রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহার বিদ্যোপার্জ্জনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কত বালকের স্কুলের বেতন দিতেন, কত বালকের ভরণপোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন। শত শত লোক রামচন্দ্রকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেন, শত শত মানব রামচন্দ্রের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, শত শত লোক রামচন্দ্রকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন! বাস্তবিক রামচন্দ্রের যে কোন বিষয় দেখি, সেই বিষয়েই আমরা আশ্চর্য্য হই! তখন আমরা বলিতে বাধ্য হইয়া থাকি, ধন্য রামচন্দ্র! ধন্য তুমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে জীবনযাপন করিতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই তোমার মানবদেহ ধারণ!

সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে রামচন্দ্রের দয়ার বিষয় কিছু বর্ণিত হইল। এক্ষণে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে রামচন্দ্র যেরূপ দয়াবান ছিলেন, তাহার কিছু আভাস দেওয়া আবশ্যক। রামচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তিনি তাঁহার নিজের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য আর কখনও ভাবেন নাই, তাঁহার পরকালে কি হইবে, এই বিষয় কখনও চিন্তা করেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্রের একমাত্র চিন্তা ছিল যে, কি উপায়ে অন্যান্য সকলের উপায় হইবে! কেমন করিয়া সাধারণ মানবে ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইবেন? রামচন্দ্র জানিতেন যে, ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার ভবপারের উপায় স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু অন্যান্য সকলের কি হইবে? ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। তিনি ভাবিতেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাহা ক্বচিৎ কেহ পাইয়াছেন, সেই কঠোর তপস্যার ফল তাঁহারা অনায়াসে লাভ করিয়াছেন, যাহার জন্য এক সময় তিনি অস্থির হইয়া বেড়াইয়াছিলেন, যাহার জন্য পৃথিবীর সমুদয় সুখস্বচ্ছন্দতা তাঁহার তিক্ত বোধ হইয়াছিল, সেই দেবেশবাঞ্ছিত মনুষ্যদুর্লভ ভগবানের দর্শন ও কৃপালাভ তাঁহার ভাগ্যে ত হইয়া যাইল, কিন্তু ইহা অপরে কেমন করিয়া পাইবে! তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, যে অমৃত ফলের আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, তাহা একাকী সমুদয় গ্রাস না করিয়া জনে জনে বিলাইবেন। এই বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটী গল্প আমাদের মনে হইতেছে। কোন সময়ে চারি বন্ধু অমরত্ব লাভ করিবার জন্য অমৃত ফল পাইবার আশায় অরণ্যে প্রবেশ করেন। বহুকাল অরণ্যে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাদের আশা মিটিল না।

তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় এক ভয়ানক জঙ্গলে যাইয়া হঠাৎ তাঁহারা এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি চারি জনকে চারিটী ফল দিয়া বলিয়া দিলেন যে, "যাহার জন্য তোমরা এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, এই সেই অমৃত ফল গ্রহণ কর, কিন্তু ইহা তোমরা আর কাহাকেও দিও না।" তিন জন তাঁহার কথামত তিনটী ফল ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না করিয়া সেই ফলের কিঞ্চিৎ মাত্র ভক্ষণ করিলেন ও অবশিষ্ট লইয়া সহরের মধ্যে আসিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আইস, ভাই! অনেক কষ্টে আমরা এই অমৃত ফল লাভ করিয়াছি. যাহার ইচ্ছা হয়, আইস, অমরত্ব লাভ কর।" অনেকেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিলেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই ফলের বিন্দুমাত্র ভক্ষণ করিলেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, রামচন্দ্রের স্বভাব এই চতুর্থ ব্যক্তির ন্যায় ছিল। তিনি আপনি অমৃত ফল একাকী ভক্ষণ করিতে পারিলেন না, তাই জনে জনে বিলাইবার ব্যবস্থা করিলেন। অনেকেই রামচন্দ্রকে পাগল মনে করিয়াছিলেন, অনেকেই উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা সরল বিশ্বাসে তাঁহার কথামত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ফলের আস্বাদ পাইয়াছেন। তাই বলি, রামচন্দ্রের শরীর দয়ায় গঠিত ছিল, নতুবা তিনি অন্যের জন্য এত ব্যাকুল হইবেন কেন? অমৃত ফল পাইয়াছিলেন, একাকী ভক্ষণ করিলেই হইত, তাহা না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন কেন? কাঙ্গালের জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি ছিল? রাম-চন্দ্রের দয়ায় কত ঘোর নাস্তিক পাষণ্ড প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? রামচন্দ্রের দয়ায় কত পাষণ্ডের জীবন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। যাহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত ছিল. তাহারা রামচন্দ্রের দয়ায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া আজ সাধূত্তম মধ্যে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেন না, সেই মহাপুরুষের দয়া যাঁহার উপর পতিত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই তাহার কার্য্য হইবে। রামচন্দ্র যাঁহাকে দয়া করিয়াছেন, তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা অবশ্যই পাইবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আহা! রামচন্দ্রের নিকট যাঁহারা ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ শুনিতে

আসিতেন, তাঁহাদের জন্য রামচন্দ্র কতই চিন্তিত হইতেন। কেমন করিয়া তাঁহারা ঠাকুরের কৃপা লাভ করিবেন, কেমন করিয়া তাঁহারা পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন, ইহার জন্য রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট কতই জানাইতেন! ইহাদের উপর রামচন্দ্রের দয়া ও ভালবাসা যেরূপ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহারা পিতা মাতার নিকট হইতে এই ভালবাসার বিন্দুমাত্রও পাইতেন না। এই ভালবাসা অতুলনীয়! রামচন্দ্রের দয়ার কথা যখনই তাঁহাদের স্মরণ হয়, তখনই তাঁহারা বিহ্বল হইয়া যান, আর জীবনে তাঁহারা সে ভালবাসার লেশমাত্রও পাইবার আশা করেন না। রামচন্দ্রের দয়া, রামচন্দ্রেই ছিল! রামচন্দ্র ইঁহাদের পিতা, মাতা গুরু, বন্ধু, আশ্রয়দাতা, যাহা কিছু সর্ব্বস্বই রামচন্দ্র! রামচন্দ্র ব্যতীত ইঁহাদের আর আপন বলিবার কেহই নাই।

রামচন্দ্র ইঁহাদের জন্য যেরূপ কাতর হইতেন, সে কথা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। ঠাকুর বলিতেন যে, আচার্য্য তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিয়া আর তাঁহার সংবাদ লয়েন না। মধ্যম আচার্য্য শিষ্যের উন্নতির জন্য তাহাকে কত কি বুঝাইয়া থাকেন। আর উত্তম আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, অর্থাৎ শিষ্য কথা না শুনিলে, তাহাকে জোর করিয়া উপদেশ অনুযায়ীক কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র ইঁহাদের উত্তম আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন। রামচন্দ্র যে দয়ার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহা না হইলে এই ঘোর পাষণ্ডদিগের জন্য কেন তিনি এত ব্যাকুল হইতেন? কেন তাহাদের উন্নতির জন্য তিনি কাতর হইয়া ঠাকুরের নিকট জানাইতেন, আবার কাহার অবনতির চিহ্ন দেখিলে কেন তিনি ক্রন্দন করিতেন? রামচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ দিয়া ইহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দয়া ও ভালবাসার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যক্ষ রামচন্দ্রের জীবনে ইহার আভাস দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

তাই বলি, যথার্থই রামচন্দ্র রামকৃষ্ণের দয়া বুঝিয়াছিলেন! তাই দয়াময় রামকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে নিজেও দয়ার মূর্ত্তিস্বরূপ হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পাঠকগণ গত বর্ষে কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছেন। বার বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, এই মহাপুরুষের জীবনের সমস্ত ঘটনাই অলৌকিক। ঐশ্বরিকশক্তি ব্যতীত জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে কাহারও দেখা যায় না। রামচন্দ্রে যে ঐশ্বরিকশক্তির বিকাশ ছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন। অনেকেই মহাত্মা রামচন্দ্রের অনেক প্রকার অমানুষ কার্য্য দেখিয়াছেন, তাহা সমস্ত আমাদের জানা নাই; তবে আপাততঃ এ অধীনের যে কয়েকটী স্মরণ হইতেছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার পারিপাট্য বা বর্ণনার মাধুর্য্য নাই। বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক সময় অতিরঞ্জিত হইয়া যায়, ইহাতে অতিরঞ্জিত বা কল্পনাপ্রসূত কিছুই নাই; কেবল-মাত্র প্রত্যক্ষ ঘটনা লিখিয়া পাঠকগণের মনে ঠিক ঠিক রামচন্দ্রের ছবি যাহাতে পড়ে, তাহারই চেষ্টা হইতেছে, কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া ঠাকুরের ইচ্ছা। যাঁহারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃতে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তৎ-পরে তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যতই রামচন্দ্রের বিষয় জানিতে পারিবেন, ততই তাঁহাদের মঙ্গল। কেন না, তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা হইলে মানব পবিত্র হইয়া মুক্ত-পুরুষের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকেন। ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্রের ভিতর অনেক সময় ঐশ্বরিক শক্তি খেলিতে দেখা গিয়াছে। না হইবে কেন? ঠাকুর বলিয়াছেন, ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত এক। ঠিক ঠিক যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তি হয়, তাঁহার ভিতর যে কোন কার্য্য হয়, তাহাই ভগবান্ করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বাসস্থান, যিনি দিবানিশি ভগবানের পাদপদ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার ভিতর সদাই ভগবান্ বিরাজমান থাকেন; সুতরাং তাঁহার কার্য্যগুলি যে ভগবানের কার্য্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই রামকৃষ্ণগতপ্রাণ

রামচন্দ্রের ভিতর ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কারণ নাই।

কোন্ দিবস হইতে রামচন্দ্রের অলৌকিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, যে দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই রামচন্দ্র ঐশ্বরিক-শক্তিতে শক্তিবান। কোন সময়ে কোন্নগরে একটী হরিসভা হওয়ায় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য সভ্যমহোদয়গণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গমন করিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় রামচন্দ্র ও মনোমোহনকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যাইলেই আমার যাওয়া হইল। হরিসভার সভ্যমহোদয়গণকে বলিলেন যে দেখ, এরা গেলেই আমার যাওয়া সাব্যস্ত হইল। ঠাকুরের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যেখানে ভক্ত, সেইখানেই ভগবান্। যেখানে রাম ও মনোমোহন, সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে কথা একবার নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার আর ভুল নাই, ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কার্য্যক্ষেত্রেও তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সেই দিবস কোন্নগরে রামচন্দ্র যেরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতর ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। হরিসভায় রামচন্দ্র "সত্য ধর্ম্ম কি ?" এই বিষয়ে এমন একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তৎপরে রাস্তায় সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। যে সময় এই সংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া বলিয়াছিলেন, "লাগ্ ভেল্কী লাগ্"। বাস্তবিক ভেল্কীই লাগিয়াছিল! রাস্তায় আবালবৃদ্ধ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে জয় রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যে কেহ বাটী হইতে বাহির হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও মহা আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! কি ভেল্কীই লাগিয়াছিল! মনোমোহন বাহ্যচৈতন্যহারা ও রামচন্দ্র উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের উন্মত্ততা অনেককেই আক্রমণ করিতে লাগিল। কোন্নগরে তখন কত শত লোক শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্রূপকারী, কিন্তু সেই দিনকার সংকীর্ত্তনের আশ্চর্য্য শক্তিতে সকলেই জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তৎপরে যখন রামচন্দ্র

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সাঁজ প্রহরে ভাতার ম'লো, কাঁদ্‌বো কত রাত। ও রাম! এখনই এই ক'র্‌চ্চো, এর পর যে, আর নাইতে খেতে সময় থাক্‌বে না।"

এই দিবস হইতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রামচন্দ্রে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই বলে মাঝে মাঝে রামচন্দ্রে অলৌকিক কার্য্য ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। অন্য এক সময় যখন ঠাকুর পীড়িত, তখন তিনি মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "মা! আমি পীড়িত, আর আমি পারি না। রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র ইত্যাদিকে (কয়েকটীর নাম করিয়া বলিয়াছিলেন) একটু শক্তি দে, এরা তৈয়ারী করিয়া আনিবে, আমি ছুঁয়ে দেব!" ঠাকুর শ্রীমুখে এই কথা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। তাই যে দিবস ঠাকুর কল্পতরু হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র রাস্তা হইতে যাহাকে পাইয়াছিলেন, ধরিয়া আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়াছিলেন এবং ঠাকুরও তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার চৈতন্যোদয় করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার দেহত্যাগের পর রামচন্দ্র কত নাস্তিক পাষণ্ডের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, কয়েকটী ঘোর পাষণ্ড বর্ব্বর, যাহাদের ঘৃণিত কার্য্যের বিষয় স্মরণ করিলে মানবসমাজে তাহাদের স্থান দেওয়া উচিত নয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের রামচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন! এক্ষণে তাহারা ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের প্রেম ও ভক্তি এবং ভগবানের নামে অশ্রুবারি দর্শন করিলে তাহাদের চরণ-ধূলি লইয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হয়! ভগবান্ পতিতপাবন, ইহা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি। আর ঐশ্বরিক শক্তি-প্রাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্রের দ্বারা এই পতিতগণের উদ্ধার, এই পাষণ্ডগণের জীবন পরিবর্ত্তন দেখিয়া আপনাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছি। ধন্য সেই মহাপুরুষ! ধন্য তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি! ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত কে কোথায় কবে সম্পূর্ণরূপে জীবন পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কে কোথায় কবে মহাপাপীকে সাধূত্তম করিতে দর্শন করিয়াছেন?

এক ব্যক্তি কিছুদিন মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি সহজে কোনও মতে কোন কথা স্বীকার করিতে চাহিতেন না।

এক দিবস তিনি মহাত্মাকে বলিয়াছিলেন যে, "মহাশয়! কিছু অদ্ভুত দেখাতে পারেন ত, আপনার কথা বিশ্বাস করিতে পারি; রামকৃষ্ণদেবকে ভগবান্ বলিতে পারি।" রামচন্দ্রকে বার বার বিরক্ত করায় তিনি সহসা বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই আজ হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমার ভিতর কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবে।" মহাত্মার এই কথা বলিবার কয়েক ঘণ্টার পরে সেই ব্যক্তি যখন তাঁহার বাটী যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার হাস্যের উদ্দীপন হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে চলিতে লাগিলেন, ক্রমেই তাঁহার হাস্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে যখন তিনি তাঁহার বাটী পৌঁছিলেন, তখন আর হাস্য নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেবল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, আর তাঁহার কথা কহিবার শক্তি নাই! বাটীর লোকেরা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে কোন উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া তিনি কেবল হাস্য করিতে থাকেন। হাস্যের বিরাম নাই! ইহা দেখিয়া বাটীর লোকেরা মনে করিলেন যে, ইঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। সেই ব্যক্তিও শেষে আপন গৃহের ছাদে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া মনে করিলেন যে, এইবার বিশ্রাম করিব। কিন্তু তাঁহার আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নাই, তখন নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। শেষে তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, "বুঝি তাঁহার নাড়ীভুঁড়ী ছিঁড়িয়া যায়।" তথাপি বিরাম নাই! তিন দিবস কোনও প্রকারে কিছু আহার করিয়া তিনি ক্রমাগত হাস্য করিয়াছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিলেও তথাপি তাঁহার মনে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহনিরসন হয় নাই। শেষে যখন বার বার কয়েকবার ক্রমাগত ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্ন দিতে লাগিলেন যে, "আজ রাম তোমায় এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিবে, তুমি গ্রহণ করিও;" আর ক্রমাগত তাঁহার স্বপ্নানুযায়ীক রামচন্দ্র সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইল। এই সময় কত দিবস ঠাকুর রামকৃষ্ণ মহাত্মা রামচন্দ্রকে ও সেই ব্যক্তিকে একই দিবসে একই রাত্রে এক প্রকার স্বপ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, "আজ তুমি অমুককে এই কথা বলিও এবং এইরূপ আজ করিও." আর সেই ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন যে, "আজ রাম তোমায় এইরূপ বলিবে, শুনিও।" তাই লোকে বলে, ভক্তে যাহা করেন, তাহা ভগবানের কার্য্য। সেই ব্যক্তি এইরূপ ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিয়াই রামচন্দ্রের চরণে মস্তকাবনত করিতে, তাঁহার চরণ পূজা করিয়া তাঁহাতে মন প্রাণ অর্পণ করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা যে কেবল একজনের সহিত ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। অনেকেরই সহিত রামচন্দ্র অনেক প্রকার ঐশ্বরিক শক্তির খেলা খেলিয়াছিলেন, সে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়। কেবল দুই একটী বিষয় বলিয়া মহাত্মার ঐশ্বরিক শক্তির আভাস দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য!

রামচন্দ্র যখন যোগোদ্যানে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি দেখিয়া শত শত মানব তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত যুবক ক্রীতদাসের ন্যায় তাঁহার চরণ-তলে বসিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিতেন। তখন মহাত্মা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মন প্রাণ অমনি তাঁহার চরণে যাইয়া অবস্থান করিত। প্রথম যে দিন এই অধীনের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছিল, যেদিন প্রথমে জীবনে ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, যে দিন তিনি ঠাকুরের লীলাস্থল পুণ্যভূমি কলির শ্রেষ্ঠ-তীর্থ শ্রীধাম দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার মস্তক হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছিল, সর্ব্বশরীর রক্তবর্ণ, দিব্য-কান্তি, মুখে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি, আর তখনই মনে করিতেছিলাম যে, ইহা নর-দেহ নহে, কোন দেবতার দেহ হইবে! তাহা না হইলে একবার দর্শনমাত্রেই কাহার সাধ্য মন প্রাণ হরণ করিয়া লয়? সেই দিন হইতেই মহাত্মার চরণে আপনি যাইয়া লুটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান মহাত্মা রামচন্দ্র অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; আর এ পর্য্যন্ত সে স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই, পারিবেন না এবং প্রয়োজনও নাই! প্রাণের শান্তি-দাতা, জীবনের পরিত্রাতা, মন-প্রাণ-হরণ-কর্ত্তা, উপদেষ্টা সম্পদে ও বিপদে একমাত্র ভরসা-দাতা, মহাত্মা রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তির বিষয় অধিক আর কি বর্ণনা করিব, একটী কথা হইতেই বুঝিয়া লউন। যিনি মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন ও কয়েক দিবস মাত্র তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারই মন প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া হৃদয়ের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন! আজ কয়েক বৎসর হইল মহাত্মা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি অসংখ্য মানবের মনে রামচন্দ্র শান্তি বিধান করিতেছেন। এখনও তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া ও তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিতে সহস্র

সহস্র লোকের কল্যাণ সাধিত হইতেছে! ধন্য সেই মহাপুরুষ, যাঁহার নাম স্মরণ করিলেও দেশের মঙ্গল হইতেছে! ইহা অপেক্ষা ঐশ্বরিক শক্তি আর কি দেখিব?

রামচন্দ্র যখন কলিকাতায় মাসে মাসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাদি দিতেছিলেন, তখন দেখিয়াছিলাম, বক্তৃতাস্থলে লোকে লোকারণ্য, অসংখ্য অসংখ্য মানব মধুর হইতেও মধুর মহাত্মার বদনে শ্রীরামকৃষ্ণবার্ত্তা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছিলেন!. কোন কোন সময়ে দেখিয়াছি, মহাত্মা জীবের দুরাবস্থায় আপনি ক্রন্দন করিয়া সমগ্র শ্রোতৃবর্গকে কাঁদাইয়াছেন; আবার যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভয়বাণী শুনাইয়া জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়াছেন, তখন সমগ্র শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় সেই শক্তি প্রবেশ করায় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন, "জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!" কেহ বা একবার বলিতে না বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন! সেই এক দিন গিয়াছে! সেই সময় মহাত্মার এরূপ ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, মহাত্মা যখন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক ঘটিয়াছে, যাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, আপনিই তাহার বিপদ পলাইয়া গিয়াছে, আর মুখ দেখিয়াই কত মানবের মনের ভাব বলিয়া দিয়াছেন! সেই সময় অনেকের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মহাত্মার নিকট যে যাহা মনে করিয়া যায়, তাহার তাহাই পূরণ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রে যে অতীব ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে, ইহা কলিকাতার অনেকেরই মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল। তাই অনেকেই ঘোর বিপদে পতিত হইয়া মহাত্মার নিকট আসিতেন এবং তাঁহাদের বিপদ হইতে পরিত্রাণার্থ চরণে পতিত হইয়া অনুরোধ করিতেন। যে বিপদ হইতে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, যাহাতে জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপদে পতিত হইয়া কয়েক ব্যক্তি মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে কেহই তাঁহাদের কি বিপদ তাহা বলেন নাই, কেননা সে বিপদের কথা শুনিলে কেহই তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া সাহস করিতে পারেন না। মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহারা কেবল ক্রন্দন করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, "আপনি বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" মহাত্মা রামচন্দ্রের করুণ হৃদয়, তাই তিনি

কাহারও কষ্ট দেখিতে পারিতেন না, কাহাকেও অধিকক্ষণ ক্রন্দন করিতে দেখিতে পারিতেন না। দয়ার্দ্রহৃদয় রামচন্দ্র তাঁহাদের ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর রক্ষা করিবেন, ভয় কি?" আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একবার যদ্যপি কোন গতিকে কেহ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে অভয়বাণী শুনিতে পাইত, তাহা হইলে আর তাহার ভয় নাই, নিশ্চয়ই তাহার মনোরথ সফল হইবে, ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল; কার্য্যেও তাহাই ঘটিত। দুই জনের বৃত্তান্ত এই স্থানে বলিতেছি, একজন হত্যাকারী, অপর ব্যক্তি জাল উইলের সাক্ষ্য প্রদানকারী।

দুই সময় দুই ব্যক্তি আসিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন মতে চরণ ছাড়িবেন না, কি বিপদ তাহাও বলিবেন না। কেবলমাত্র এক কথা, "মহাবিপদে পতিত হইয়াছি, আপনি রক্ষা করুন!" হৃদয় যাঁহার কারুণ্যরসে প্লাবিত, তিনি কথনও বিপদের সময় কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্রন্দন দেখিয়া রামচন্দ্রের করুণ হৃদয় তাঁহাদের কষ্টের জন্য ব্যথিত হইল। তখন তিনি আর এরূপ বলিতে পারিলেন না যে, তোমাদের কি বিপদ তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কিছু বলিতে পারি না। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তোমাদের ভয় নাই, ঠাকুর রক্ষা করিবেন। তৎপরে তাঁহারা দুইজনেই দুই সময়ে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। যাহার জন্য রামচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হয়, তাহার আর সাংসারিক কোন বিপদ হইতে পরিত্রাণের কথা কি—এই মহামায়ায় বিজড়িত, জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিঘূর্ণিত, ভবসাগরের অকূল জলধিতে নিমগ্নপ্রায় মানবের মহাবিপদ হইতেও পরিত্রাণের আর কোনও ভয় থাকে না! তাহা না হইলে পাষণ্ডগণের পরিত্রাণ, দাম্ভিক দুষ্টগণের জীবন পরিবর্ত্তন, মহাপাপীগণকে সাধকরূপে পরিবর্ত্তিত করণ, কেমন করিয়া রামচন্দ্রের দ্বারা সাধিত হইল? ইহাই রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি! এইরূপ ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশেই কেবলমাত্র জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ মানবের কার্য্য নহে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীভূত সহচর বলিয়াই মহাত্মা রামচন্দ্রের এইরূপ ঐশ্বরিক শক্তি দেখা গিয়াছে। এইরূপ মহাপুরুষগণের জন্ম হয় বলিয়াই এই ঘোর কলিকালে আজও পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছেন। তাই বলি, ধন্য রামচন্দ্র! ধন্য তুমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমার কৃপাকণা

হইলে আমাদের ভবভয় বিদূরিত হইবে। তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও ভরসা। আমরা তোমারই কৃপার ভিখারী, তুমি অভয়বাণী প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ের শান্তি বিধান কর।

মহাত্মা রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহাপুরুষগণ মানব দেখিয়া তাহাদের ভাবানুযায়ীক কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের একটী ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ বলিয়া পরিগণিত। রামচন্দ্রকে অনেক সময় এই ভাবে কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে। ভক্তের মনের ভাব ব্যক্ত করা ও তদনু-যায়ীক তাহার সহিত বাক্যালাপ করার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রের জীবনে ঘটিতে দেখিয়াছি। কোন সময় দুইজন ভক্ত যোগোদ্যানে যাতায়াত করি-তেন। ইহারা প্রায়ই আহারাদি করিয়া বৈকালে আসিতেন; তাহাতে কোনও সেবক বলিয়াছিলেন, তোমরা প্রাতে আস না কেন? এক দিবস তাঁহারা গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন যে, যগুপি আজ মহাত্মা রাম-চন্দ্র আমাদের আপনি যাচিয়া বলেন যে, তোমরা যোগোদ্যানে প্রাতে আসিয়া প্রসাদ পাইবে," তাহা হইলেই আমরা প্রাতে আসিব, নতুবা যেমন আসি, তেমনি আসিব। সেই দিবস যেমন তাঁহারা যোগোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি মহাত্মা তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ! তোমরা এবার থেকে সকাল বেলা এসো, ঠাকুরের পূজা দর্শন করিবে ও প্রসাদ পাইবে।" তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আর এক সময় ঠাকুরের সেবার তত্ত্বাবধানকারী স্নান করিতেছেন, রামচন্দ্র ঠাকুরের পূজা করিতেছেন, এমন সময় কোন লোক রান্না-ঘরে ঠাকুরের দুগ্ধ হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ কোন দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। মহাত্মা পূজা করিতেছেন, হঠাৎ পূজা বন্ধ করিয়া সেই সেবককে ডাকিয়াছিলেন এবং পূজার পর তাহাকে তাহার অমনোযোগীতার নিমিত্ত অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেবক ভাবিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য? রান্না-ঘরে সেই ব্যক্তি দুগ্ধ লইয়াছে। মহাত্মা ঠাকুরঘরে বসিয়া পূজা করিতেছেন, উনি কেমন করিয়া এই বিষয় জানিতে পারিলেন? ভক্তের- নিকট কিছুই লুক্কায়িত থাকে না, অন্তরে অন্তরে সকল বিষয়ই জানিতে পারেন। তাই কি ভক্ত ও ভগবান্‌কে ঠাকুর এক বলিতেন?" রামচন্দ্রের জীবনে এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই দেখা যাইত; সুতরাং এ

সকল ঘটনা আমরা অলৌকিক বলিয়াই বিবেচনা করিতাম না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যখন যাহাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তৎমুহূর্ত্তে তাহা ঘটিতে দেখিয়াছি।

কোন সময় একজন উকীল রামচন্দ্রের কর্ম্মস্থলে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথা-বার্ত্তা কহিয়া আসিতেন। কর্ম্মস্থলে রামচন্দ্রের একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল, সেই গৃহে বসিয়া কোন লোক যাইলে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। এক দিবস সেই উকীল বলিয়াছিলেন যে, "মহাশয়! আপনি এত কথা বলেন, সব বিশ্বাস ক'রতে পারি, যদি আমার মতন পাষণ্ডের মন বিগলিত করিয়া ভগবানের জন্য কাঁদাতে পারেন!" রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে সব হইতে পারে। তখন সেই উকীল বলিলেন, "মহাশয়! ওসব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলি না। বলুন! আমাকে কাঁদাতে পারেন কি না?" বার বার এইরূপ ভৎর্সনা বাক্য বলায়, রামচন্দ্র আরক্তিম-নয়নে বলিয়া উঠিলেন যে, "অবশ্যই আপনি তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্য ক্রন্দন করিবেন।" আহা! সেই ব্যক্তিই ধন্য, যাহাকে রামচন্দ্র দয়া প্রকাশ করিয়া, ঠাকুরের কৃপার অধিকারী করিয়া দিতেন! রামচন্দ্র বলিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে ঠাকুর আপনাকে কৃপা করিবেন। কিন্তু দয়াময় রামকৃষ্ণ আর বিলম্ব সহিতে পারিলেন না, তাঁহার পরম ভক্ত রামচন্দ্রের কৃপা পাইয়াছে, আর কি তাঁহার কৃপা পাইবার বিলম্ব থাকে? তাই, সে উকীল মহাশয়ের তিন দিন ত বহু দূরের কথা—তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইল না, অমনি তিনি হু হু করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন! তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন করিতে চাহিয়াছেন, তাই রামচন্দ্রের কৃপায় যেন গঙ্গা যমুনা আসিয়া তাঁহার চক্ষে আবির্ভূতা হইলেন! কি আশ্চর্য্য! এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যিনি পাষাণ বলিয়া আপনাকে বর্ণনা করিতেছিলেন, যিনি জীবনে কখনও ক্রন্দন করেন নাই এবং কোনও মতে তাঁহার চক্ষে জল আসে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তিনিই আবার এইক্ষণে চিৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! ইহাই রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি! রামচন্দ্রের কৃপায় পাষাণ দ্রবীভূত হয়, দাম্ভিক প্রেমিক হয়, মহাপাপী সাধু হয়! ইহা অপেক্ষা আর ঐশ্বরিক শক্তি কি দেখিব?

আবার দেখুন, কেহ কেহ রামচন্দ্রের বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মনে মনে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু

তাঁহাদের সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহারা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের অন্তরের ইচ্ছা যে, মহাত্মার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, তাহা হইলেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া যাইবে। এরূপ কয়েকটী ব্যক্তিই মহাত্মার নিকট হইতে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছেন। এমন কি কেহ বা মহাত্মার দেহত্যাগের পরেও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন। একজনের দৃষ্টান্ত এই স্থলে বলিতেছি।

কোন গৃহস্থের কুল-বধূ মহাত্মার বিষয় শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং অন্তরে তাঁহার বেদনা জানাইতেন। তিনি কুল-বধূ, তাঁহার আর মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু মহাত্মার অপার দয়ায়—তিনি স্বপ্নে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়াছিলেন এবং তৎপরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কোন আত্মীয় ঠাকুরের পরম ভক্ত এবং মহাত্মার শিষ্য। পরে সেই আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি অনেকবার মহাত্মার চরণ দর্শন করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এ কি সামান্য কথা! ঘরে ঘরে যাইয়া, মহাত্মা রামচন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত করিয়াছেন। যেখানে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সেখানে স্বপ্নে যাইয়া আপন কার্য্য সাধিত করিয়াছেন। মহাত্মার একমাত্র মহৎ কার্য্য ও জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার। তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন এ দেশে অতি অল্প মানবেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে এ দেশে প্রচার করা কঠিন নহে, কেন না অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু তখন কত বিঘ্ন বাধা, কত উপহাসের মধ্যস্থলে বসিয়া মহাত্মা সর্ব্ব-সাধারণকে আহ্বান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব ও মধুর উপদেশ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আজ ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম প্রচার হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় আজ দেশে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা হইতেছে, তাঁহারই মহাশক্তির বলে আজ অসংখ্য নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন! তাঁহার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ অধর্ম্মকে পদ-দলিত করিয়া ধর্ম্ম আপন জয় ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন! ইহাই মহাত্মা রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের সন্ন্যাস-ভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য, মহাত্মা রামচন্দ্রের সন্ন্যাসভাব সম্বন্ধে লিখিতে এইবার প্রয়াস পাইতেছি। অনেকে হয়ত এই প্রবন্ধের কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিবেন, কেহ কেহ বা উপহাস করিবেন; কেন না অনেকের ধারণা যে, সেবক রামচন্দ্র একজন গৃহীভক্তমাত্র ছিলেন, কিন্তু উপহাস বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার ভয়ে, সত্য প্রকাশ করিতে কখনও বিন্দুমাত্র সন্দিহান করিব না। যে চক্ষে মহাত্মাকে আমরা দর্শন করিয়াছি, যে চক্ষে আজিও তাঁহাকে দর্শন করিতেছি, যে চক্ষে ভগবান্ করুন, চিরদিন যেন সমভাবে দর্শন করি, তাহারই আভাস দেওয়া, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যাঁহারা মহাত্মাকে, তাঁহার শেষ জীবনের তিন বৎসর দর্শন, আলাপন এবং সঙ্গ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সন্ন্যাস-ভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই দেখেন নাই, জানেনও না; কেননা, এই তিন বৎসরকালই তিনি পূর্ণ সন্ন্যাস-ভাবে কালাতিপাত করিয়াছেন এবং এই সময়েই তাঁহার জীবনের চরম উৎকর্ষ সময় বলিয়া আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি। সাধন করিতে করিতে সাধক যেমন সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, সেইরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রও শেষ সময়ে সাধকের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

যদ্যপি কেহ বলেন যে, এই তিন বৎসর পূর্ব্বে কি রামচন্দ্রের সন্ন্যাস-ভাব আদৌ ছিল না? তাহা নহে। এত দিন ইহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল, এই শেষ সময়েই তাহার বিকাশ হয়।

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি? সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ। রামচন্দ্রের জীবনে ত্যাগের ভাব বরাবরই ছিল। আসক্তি ত্যাগের কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, তাই সে বিষয় এবার আর বিশেষ কিছু বলিব না। তবে ভগবান্ লাভ করিতে হইলে জীবন কিরূপে অতিবাহিত করা উচিত, সন্ন্যাসভাবে বা গৃহস্থভাবে এই বিষয়ে মহাত্মা রামচন্দ্রের কি অভিপ্রায় ছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিব।

যে সময় রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার নিকট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রাপ্ত হইবার জন্য

অনেকে যাতায়াত করিতেন এবং কেহ কেহ শেষে শিষ্যত্ব গ্রহণও করিয়াছিলেন। এই শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিত ছিলেন এবং কেহ কেহ অবিবাহিত ছিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্রের যদ্যপি গৃহস্থভাব থাকিত, অর্থাৎ বিবাহাদি করিয়া সংসার প্রতিপালনপূর্ব্বক ঈশ্বরলাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহাই যদ্যপি তাঁহার অন্তরে ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি শিষ্যগণকে সংসারী হইতে উপদেশ দিতেন। তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। তাঁহার কোন শিষ্যই বলিতে পারেন না যে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে অনুমতি দিয়াছেন। তবে মহাত্মার এই শেষ তিন বৎসরের ভাব, আর পূর্ব্বের ভাবে প্রভেদ কি ছিল? প্রভেদ ছিল সামান্য। তাহা পরে বলিতেছি। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, তবে কি সংসারী লোকের ঈশ্বর লাভ হয় না, ইহাই কি মহাত্মার উদ্দেশ্য ছিল? তাহা নহে। তাহা হইলে তিনি সংসারী-দিগকে শিষ্য করিতেন না। সংসারী হইয়া সংসারে থাকিয়া কিরূপে অনাসক্ত ভাবে থাকিতে হয়, ইহাই তাহাদের উপদেশ প্রদান করিতেন। যেমন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাহাকেও এরূপ বলিতেন না যে, সংসারে থাকিলে ঈশ্বর লাভ হয় না, অথচ তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথা বাহির হইত, আমরাও ঠিক সেই ভাব মহাত্মা রামচন্দ্রে দেখিয়াছি। তিনি কখনও বলিতেন না যে, সংসারীদিগের কোনও উপায় নাই, অথচ যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদের উপর একমাত্র উপদেশ, বিবাহ করিও না। ইহাই মহাত্মা তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন। আসক্তিত্যাগই মহাত্মার উপদেশের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। সুতরাং যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা পাছে বিবাহাদি করিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়েন, এই জন্যই তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সংসারে জড়িত হইতে নিষেধ করিতেন এবং এই ভাবে গঠিত করিবার জন্যই তিনি তাঁহার ৫।৬ জন শিষ্যকে যোগোদ্যানে রাখিয়া তাহাদের জীবন গঠন করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই প্রকার ভাব ছিল যে, ইহাদেরও তিনি তাঁহার জীবনের ন্যায় জীবন গঠন করাইবেন। অর্থাৎ ইহারা ঠাকুরের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিবে। তিনি আপনি যেমন কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণসার করিয়াছিলেন, তেমনি সংসারে প্রবেশ না করিয়া, ইহারাও অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিবে। ইহাই তাঁহার পূর্ব্বের ভাব ছিল। কিন্তু অর্থের কি মোহিনী শক্তি! রামচন্দ্র যাহাদের

এই ভাবে গঠিত করিতেছিলেন, যাহাদের আপনি যত্নপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, এই অর্থ তাহারা ঠাকুরের সেবায় অর্পণ করিবে, তাহারা সকলেই অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া মহাত্মাকে পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়াছিল। অর্থ—তাহার আপনার কার্য্য সে করিবেই! সে তাহার মোহিনী শক্তিতে মানবকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেই। সুতরাং এই মোহিনী শক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে কেহই সক্ষম হয়েন না। ইহা রামচন্দ্র কি জানিতেন না? অবশ্যই জানিতেন। তবে তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, তাঁহার ধারণা ছিল, ঠাকুরের কৃপায় যেমন তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মিলীত হইয়াছে, তেমনি ইহারাও তাঁহার কৃপায় অর্থের প্রলোভন হইতে এড়াইতে পারিবে; কিন্তু ঠাকুরের তাহা ইচ্ছা নহে। অর্থের বশীভূত না হইয়া, অর্থকে আপন বশে আনয়ন করা, ইহার কেবল জগতে একটী দৃষ্টান্ত থাকিবে—সেই দৃষ্টান্ত মহাত্মা রামচন্দ্রের। আর এ পর্য্যন্ত সেইরূপ জীবন কাহারও দেখিতে পাইলাম না, পাইবার আশাও করি না। কেন না, ঘরে ঘরে জনক রাজা জন্মগ্রহণ করেন না। আপনি সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া, অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক অর্থকে ঠাকুরের জন্য খোলামকুচির ন্যায় ব্যবহার করা, ইহার কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় জলন্ত দৃষ্টান্ত, জগতে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন লোকে একবাক্যে বলিতে থাকিবে, জনকের দ্বিতীয়মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণসেবক রামচন্দ্রের জীবন অতুলনীয়, অচিন্তনীয়!

মহাত্মা রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, যাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ঠাকুরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহারা একে একে সকলেই সংসারী হইতে বাসনা করিল, তখন শেষ যে দুই জন শিষ্য তাঁহার নিকট যোগোদ্যানে বাস করিতেছিল, তাহাদের তিনি পূর্ণ সন্ন্যাসভাব দিয়াছিলেন। এই সময় যাহারা মহাত্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি কি প্রকার সন্ন্যাস বা ত্যাগের ভাবের কথা সর্ব্বদাই কহিতেন। এই সময় তিনি বলিতেন যে, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমার ন্যায় জীবন প্রস্তুত করাইব, কিন্তু তাহা হইবার নহে। এক্ষণে বেশ বুঝিতেছি, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া না দিলে, সংসারের দিকে মন প্রধাবিত হইবেই হইবে এবং তখন ভগবানের ভাব হইতে বহুদূরে পতিত হইয়া যাইবে। তাই, তাঁহার দুইজন শিষ্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা তাঁহাদের স্বকপোল-

কল্পিত ভাব। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কেন না, মহাত্মা যে প্রকারে ইঁহাদের সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই জানেন। এক দিবস বিজয়া দশমীর দিন, মহাত্মা রামচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সাক্ষী করিয়া ইঁহাদের সন্ন্যাসভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে যে প্রকারে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই দিনকার একটী কথা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। যোগোদ্যানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখে মহাত্মা সেই দুইজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, এই ঠাকুরের সম্মুখে আর আজ এই বিশেষ দিনে, যদ্যপি আমার কিছু তোদের আশীর্ব্বাদ করিবার থাকে, তবে যেন কখনও তোদের দাসত্ব করিয়া ঠাকুরের সেবা না করিতে হয়। যে দিন কিছুই জুটিবে না, সে দিন গাছের একটা নারিকেল ভেঙ্গে ভোগ দিবি, আর রামকৃষ্ণকুণ্ডের জল পান করে থাক্‌বি। (অর্থাৎ না খেতে পেয়ে মরে যাস্, সেও স্বীকার, তবু দাসত্ব কর্‌বি না, তবু আপনার জীবন পরিবর্ত্তন করিস্ না)। অন্য এক সময়ে এই দুইজনের একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভিক্ষা করিতে পারিবি কি না? সেও আনন্দের সহিত বলিয়াছিল, আপনার আদেশে অবশ্যই পারিব। তৎপরে তাহাকে ভিক্ষার নিয়মাদি বলিয়া দিয়াছিলেন। আর এক সময়, এই দুইজন শিষ্য গৈরিক বসন পরিধান করিতে আপত্তি করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি যখন তোদের দিয়াছি, তখন তোদের ভয় কি? তোদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ লোকে ব'ল্লে, তোরা বল্‌বি যে, তোদের গুরু দিয়াছেন।

আর এক সময়, যখন এই দুই জনের মধ্যে একজন শিষ্যের পিতা, তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হওয়ায়, তাহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, দেখ! তোমার পিতার প্রয়োজন, আর পিতার সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; তুমি স্বচ্ছন্দে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতৃসেবা করিতে পার। এই কথায় শিষ্য উত্তর করিল যে, আপনি ত আমাদের কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন মহাত্মা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, "যদ্যপি পিতৃসেবা করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখনও অসন্তুষ্ট হইব না, বরং আমিই তোমার কর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া দিব, আর আমি যে নিষেধ করিয়াছি, সে ত ঠাকুরের জন্য, অর্থাৎ যদ্যপি ভগবান্ চাও, ঠাকুরকে চাও, তাহ'লে তোমার চাকরির চেষ্টা কি, চেষ্টা হ'লে আমিই ভেঙ্গে দেবো।"

এই "ভেঙ্গে" কথাটী তিনি যে কি স্নেহে, ও কি প্রকার উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই স্থানেই মহাত্মার স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, ভগবান্ লাভ করিতে হইলে কি প্রকার জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

এই সকল কথা এবং এই প্রকার ভাব মহাত্মার শেষ জীবনে যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার ভাব বুঝিতে পারেন নাই। এতদিন যে ত্যাগের ভাব তাঁহার অন্তরে অন্তরে ছিল, তাহা এই শেষ সময়ে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিবানিশি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ বলিতেন, আর তাঁহার পরমভক্ত প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র, যিনি দিবানিশি সেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জ্বলন্তমূর্ত্তি চিন্তা ও ধ্যান করিতেছেন, তাঁহার ভিতর যে ত্যাগের ভাব বা সন্ন্যাসভাব পূর্ণরূপে না থাকিবে, ইহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়!

রামচন্দ্রের ভিতর যে সন্ন্যাসভাব দেখিয়াছি, তাহা একজন উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসীর ভিতর দেখি নাই। কোনও কোনও সন্ন্যাসী, রোগ অথবা তীর্থ ভ্রমণের জন্য, কখনও কখনও ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্র পরশ্ব দিবস কি হইবে, তাহা কখনও ভাবিতেন না। আপনার নিকট কিছুই নাই, অথচ ঠাকুরের উৎসব করিতে হইবে, এমন কত সময় দেখিয়াছি যে, রামচন্দ্র কখনও সে বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ নহেন। একটী পয়সা নাই, অথচ হয়ত শত শত টাকার ফর্দ্দ হইতেছে। রামচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস যে, ঠাকুরের কৃপায় অর্থ আপনি আসিয়া যাইবে। ইহাই ত সন্ন্যাসীর লক্ষণ—পূর্ণ নির্ভরতা! সন্ন্যাসী ভিন্ন এরূপ নির্ভরতা কখনও সম্ভবপর নহে। কৈ, সংসারের মধ্যে আর ত এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না! যাঁহার সংসার আছে, স্ত্রী আছে, অবিবাহিতা কন্যা আছে জানিয়াও যিনি শত শত মুদ্রা উপার্জ্জনপূর্ব্বক এক পয়সার সংস্থান না রাখিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ করিলেন, যাঁহার দেহত্যাগে তাঁহার স্ত্রী ভিখারিণীস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীভূত সহচর রামচন্দ্রকে পূর্ণ সন্ন্যাসী বলিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিনও তাঁহাকে গৃহস্থ বলিয়া দেখি নাই, গৃহস্থের ভাব বিন্দুমাত্র তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। যতদিন তাঁহার চরণতলে অবস্থান করিয়াছি, পূর্ণ সন্ন্যাসীভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যতই দিন যাইতেছে, যতই দেখিতেছি যে, সংসারে এরূপ এখন আর একটীও জন্মগ্রহণ

করেন নাই বা করিতেছেন না, যতই দেখিতেছি যে, রামচন্দ্রের তুলনা কাহারও সহিত হইতে পারে না, ততই আপনার ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে। যাহারা রামচন্দ্রকে সংসারী বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার ষোল অংশের এক অংশ ত্যাগ ভাব যদি জীবনে দেখাইতে পারেন, তাঁহার নির্ভরতার এক বিন্দুমাত্রও যগুপি জীবনে অনুকরণ করিতে পারেন, তাঁহার মায়াত্যাগের কিঞ্চিৎমাত্রও জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারেন, তবেই আমরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া তাঁহাদের চরণে মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হইব। নতুবা ঘোর সংসারী হইয়া শুধু রামচন্দ্রের দোহাই দিয়া জীবন কাটাইলে কি হইবে? ইহা কেবল আত্ম-প্রতারণা মাত্র।

রামচন্দ্রের শেষ সময়ে যে কেহ উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, তাহাকেই সংসার ত্যাগের কথা বলিতেন। গৃহস্থ আসিলে তাহাকে মনে মনে আসক্তি ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। এই সময় দুই ব্যক্তির অন্তরে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, মহাত্মার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। এক দিবস তাহা-দিগকে রামচন্দ্র এরূপ ত্যাগের কথা উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি আপনি আমাদের বলিয়াছিলেন—"আজ উহাদের এরূপ ত্যাগের কথা বলিয়াছি যে, যগুপি নিতান্ত ঠাকুরের প্রতি ভক্তি থাকে এবং সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবেই এ স্থানে পুনরায় আসিবে, নতুবা উহাদের এই পর্য্যন্ত।" তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সংসারের প্রতি এক বিন্দু মায়া থাকিতে ভগবান্ লাভ একেবারেই সম্ভব নহে। এই সময় যাহাকে তিনি ঘোর সংসারী বলিয়া জানিতেন, তাহাকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাই এক দিবস, তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদ্বয়কে বলিয়াছিলেন যে, উহাদের (অর্থাৎ কয়েকটী সংসারী লোককে উপলক্ষ্য করিয়া) দ্বারা আর ঠাকুরের কোনও কাজ করাস্‌নি, বা কোনও কার্য্যের ভার দিস্‌নি, উহারা ঘোর সংসারী হইয়াছে, তোরা আপনারা যতটুকু পারবি,—করবি, বল্‌বি ঠাকুর! এইটুকু পারিলাম না—সেও ভাল, তথাপি উহাদের দ্বারা আর কোনও কাজ করান আমার ইচ্ছা নয়।

মন হইতে সর্ব্বপ্রকারে কামিনী-কাঞ্চন-ভাব ত্যাগই যে জীবনের চরম উপলক্ষ্য, ইহা রামচন্দ্র চিরকাল বলিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তে তিনি লিখিয়াছেন যে, "তিনি (পরমহংসদেব) একজনকে চিরসন্ন্যাসী করিয়াছেন, আর একজনকে অৰ্দ্ধেক-সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী করিয়া

রাখিয়াছেন।” এই স্থানে মহাত্মা এরূপ লিখেন নাই যে, একজনকে ঘোর গৃহী করিয়া রাখিয়াছেন; যাহাকে ঠাকুর কৃপা করিয়াছেন, তাহাকেই সন্ন্যাসী করিয়াছেন, অর্থাৎ সন্ন্যাসই জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহাই মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী পাঠে ইহা বিশেষরূপে বুঝা যায়। “সাধনের অধিকারী” নামক দ্বাদশ বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ভিন্ন সাধনের অধিকারী হওয়া যায় না এবং ভগবান্ লাভ অসম্ভব। তবে এতদিন এই ভাব গুপ্তভাবে ছিল, তাঁহার শেষ সময়ে ইহা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র সামান্য গৃহীভক্তমাত্র ছিলেন না।

রামচন্দ্র সংসারে থাকিয়াও মহাত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। রামচন্দ্রের ন্যায় ত্যাগ, সন্ন্যাসীগণের মধ্যেও অতি অল্পই দেখা যায়। সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও কেহ কেহ শরীরের প্রতি মমতা রাখেন, কেন না তাঁহারা বলেন যে, শরীর সুস্থ থাকিলে তবে সাধন ভজন করা যায়, কিন্তু মহাত্মা রামচন্দ্রকে তাঁহার শরীরের দিকে লক্ষ্য করিতে বলিলে বলিতেন যে, “ঠাকুরের জন্য শরীরটা যাবে, একি বেশী কথা?” তিনি শরীরের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিতেন না। সংসার, পরিবারবর্গ, বিষয়, সম্পত্তি, দেহ, মন, সর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন! ইহাই সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠের পরিচয়! তাই বলি, সংসারে থাকিয়াও রামচন্দ্র জনকরাজার ন্যায় সন্ন্যাসীর গুরু ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

“রাম দাদা।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক ৺রামচন্দ্র দত্তের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্তজীবন কিরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাহাও রামচন্দ্রের ভক্তের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে “তত্ত্ব-মঞ্জরীতে” প্রকাশিত হইয়াছে। কিয়ৎ পরিমাণে বলিলাম, তাহার কারণ এই, যিনি যতই লিখুন, ভক্তের প্রভুর সহিত সম্যক আন্তরিক সম্বন্ধ কেহই প্রচার করিতে সক্ষম নয়। ভক্তের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে ভক্তিরত্ন গোপনে রক্ষিত থাকে, তাহার বর্ণনা সেই ভক্তই করিতে সক্ষম। কারণ, সে হৃদয়ভাব বর্ণনার উপযোগী, অদ্যাবধি কোনও ভাষা হয় নাই।

সে ছবি ভক্তের হৃদয়ে থাকে, মুগ্ধচিত্তে কেবল ভক্তই তাহা দেখেন, আর কাহারও সে স্থলে প্রবেশ অধিকার নাই। সে প্রভুর মন্দির, প্রভুই বিরাজ করেন। সেই মন্দিরে ভক্তের সহিত প্রভুর অনন্ত লীলা। আমি কেবল, আমি যে ভাবে রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

রামচন্দ্রের সিমলা বাটীতে, রামচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিন তেজচন্দ্র মিত্র নামে একজন ভক্ত ষ্টার থিয়েটারে (ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন ষ্ট্রীটে) একটু চিরকুট লিখিয়া যান যে, সিমলা মধুরায়ের গলিস্থিত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে প্রভু উদয় হইবেন। ভক্ত আমার বিনা অনুরোধে সেই চিরকুট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছি, ঐ ভক্ত পরমহংস-দেবের আদেশে চিরকুট লিখিয়া গিয়াছিলেন। থিয়েটারে গিয়া তাহা পাঠ মাত্রেই আমি আকর্ষিত হইলাম। ধীরে ধীরে চলিলাম, প্রতি পদবিক্ষেপে ভাবিতে লাগিলাম, বিনা আহ্বানে কেন যাইব! দাঁড়াই, ফিরিব মনে করি, কিন্তু চলিলাম। এমন কি রামচন্দ্রের বাটীর গলিতে আসিয়াও ইতস্ততঃ করি-লাম। অবশেষে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামচন্দ্র তখন তাঁহার বাটীর দ্বারদেশে ছিলেন। বোধ হয় আমায় চিনিতেন, আমাকে দেখিবামাত্র আমায় পরম যত্নে আহ্বান করিলেন এবং সামাজিক শিষ্টাচার না করিয়া প্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। অতিশয় আগ্রহ, যেন তাঁহার মনে ভয় হইতে লাগিল, হয় তো এটা কি খেয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে, স্বর্গের দ্বারে আসিয়া আবার পাছে ফেরে! রামচন্দ্র বিশেষ যত্নে প্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রভু দুইবার থিয়েটারে আসিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট পরিচিত ছিলাম বটে, কিন্তু যে পতিতপাবন আমায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশ্বাস বাক্য পাইয়া ফিরিলাম।

প্রভু যেখানে যাইতেন, রামচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু যখন থিয়েটারে আসিয়াছিলেন, প্রভুর নিমিত্ত রামচন্দ্র ভোগ পাঠান, তত্রাপি স্বয়ং আসেন নাই! থিয়েটার তিনি কলুষিত ভূমি জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে আমার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া, তিনি তাঁহার বন্ধু রামকৃষ্ণা-শ্রিত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ যে, প্রভু যে স্থলে পদার্পণ করিয়াছেন, যেখানে পতিতকে কৃপা করিতে উদয় হইয়াছেন, সে স্থান আমি কলুষিত জ্ঞান করিলাম!

প্রভুর লীলা প্রভুই জানেন, দীনদয়াময় থিয়েটারদর্শনচ্ছলে দীনকে দয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি মূঢ়, কিরূপে বুঝিব? দেবেন! শীঘ্রই দেখিবে, থিয়েটারের লোক, আর সামান্য থিয়েটারের লোক থাকিবে না, প্রভুর কৃপায় সকলেই আমার আরাধ্য ব্যক্তি হইবে।"

ইহার পর দক্ষিণেশ্বরে রামবাবুকে দর্শন করি। অতি দীনভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, পঞ্চবটীতে আমায় লইয়া গেলেন। তত্ত্বমঞ্জরীর পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, রাম পরমহংসদেবকে অবতার জ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত দেবেন বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, আমারও ধারণা প্রভু অবতার। আমার এই ধারণা শুনিয়া রাম বিভোর! "গিরিশ দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তদবধি আমিও "রাম দাদা" বলিতাম। পঞ্চবটীতে রামদাদা গদগদ কণ্ঠ, হৃদয়াবেগে কথা আট্‌কাইয়া যাইতেছে, বলিতে লাগিলেন,—"গিরিশ দাদা, বুঝিয়াছ কি এবার একে তিন, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! তাঁহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ অবতারে তিনাধারে তাহার বিকাশ ছিল।" রামদাদা যত পারিলেন, বলিতে লাগিলেন, ভাব কতক প্রকাশ পাইল, ভাবুকের ভাব কতক অন্তরে রহিয়া গেল। রামদাদার তখন আমি এরূপ আত্মীয় হইলাম যে, আমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই রহিল না। পুনঃ পুনঃ করজোড় করিতে লাগিলেন,—বোধ হয় আমি নিবারণ না করিলে পঞ্চবটীতে লুণ্ঠিত হইতেন। আমাকে পবিত্র হইতে পবিত্র জ্ঞান করিলেন। তাঁহার পরমাত্মীয় হইলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর উক্তি গানে আছে,—

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে!"

আমি যেন রামদাদার প্রাণের অধিক প্রিয়তম হইলাম। সেদিন রামদাদা আনন্দে বিভোর! যেন তিনি কি অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়াছেন! ইহার পর সর্ব্বদাই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত। থিয়েটার যেন তাঁহার তীর্থস্থান হইল। থিয়েটারে না গেলে, আমার সহিত ঠাকুরের কথা না কহিলে যেন তাঁহার দিন যাপন হইত না। আমি যে কথা বলিতাম, সে কথার বিরুদ্ধে যে কোনও কথা হইতে পারে, তাহা তাঁহার মস্তিষ্কে স্থান পাইত না। কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ কথা কহিত, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিতেন,—"কি! গিরিশদাদার কথার উপর কথা, ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ওর পাঁচসিকা পাঁচ আনা বুদ্ধি।" রামদাদা অপেক্ষা আমি যে কোন অংশে বুদ্ধিমান বা বিবেচক, ইহা আত্মম্ভরি করিয়াও

আমি বুঝিতে পারিতাম না। কেননা পদে পদে আমি দেখিতে পাইতাম যে, রামদাদা অতি বিচক্ষণ! রামদাদার আর পরামর্শ কি, পরামর্শের বিষয় এক ঠাকুর! ঠাকুরকে লইয়া কি করিবেন, ঠাকুরকে কিরূপে প্রচার করিবেন, কিসে ঠাকুরের সেবা উত্তম হয়, দিবানিশি তাঁহার এই চিন্তাই ছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"রাম আমায় বড় ভক্তি করে।" ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিবলে রাম অভ্রান্ত ছিলেন। প্রায় অনেকের বাড়ী মহোৎসবের আয়োজন হইলে, তাঁহাকে রামদাদার সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হইতে হইত। কারণ ভক্তপরিবৃত ঠাকুরকে লইয়া রামদাদার বাড়ীতে হামাসা পরব ছিল। যাহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে রামদাদার গৃহে উপস্থিত হইতেন, প্রসাদ না পাওয়াইয়া রামদাদা তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। সুতরাং মহোৎসবের আয়োজনে, রামদাদার উপদেশ প্রয়োজন হইত। কিন্তু রামদাদার, তাঁহার নিজ বাড়ীর মহোৎসবে কি কি ভোজ্যদ্রব্য আয়োজন করিবেন, সে পরামর্শ আমার সহিতই হইত। "কি বল গিরিশ দাদা, মালপো করা যাক্ —জিলিপি ফরমাস দেওয়া যাক,—অমুক হোক—তমুক হোক।" বলা বাহুল্য যে, তিনি যেরূপ স্থির করিতেন, তাহার একটীও পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি আমার ছিল না।

ভক্তের নানা ভাব, ভাবের অভাব পাষণ্ডেরও নাই। উন্মত্ততাবশতঃ একদিন থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণামও করিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে তাকে বলেন, "শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচী খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালাগালি দিয়াছে।" অনেকেই বলিতে লাগিল— "ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি; ওর কাছেও আপনি যান?" আমার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়া অনেকেই আমাকে তিরস্কার করিলেন। পরে রামদাদা উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন। রামদাদার চরিত্র এই ছিল যে, কোনও রূপ ঠাকুরকে যদি কেহ শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিত, তাঁহার শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তখনই তিনি সে ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইতেন। রামদাদা কলিকাতাতেই আমার গালাগালির কথা শুনিয়াছেন; শেষ প্রণাম করিয়াছি, তাহাও শুনিয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর যখন তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন, তিনি বলিলেন,—"বেশ তো করিয়াছে।" ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোন—শোন, রাম কি বলে শোনো, আমার মাতৃ পিতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে!" রামদাদা অবিচল, বলিলেন, "হাঁ ত! কালীয়-

নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া, বলেন, তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় নাগ বলিয়াছিল, ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্গীরণ কিরূপে করিব! আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাই দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে।" কথা শুনিয়া প্রভুর মুখ-মণ্ডল আরক্ত হইল, তেজপুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল, তথাপি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'যাই হোক, আর কি তাঁর বাড়ীতে যাওয়া ভাল?' অনেকেই বলিল, "না।" পতিতপাবন বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ী আনিতে বল, চল, তার বাড়ী যাই।" পাঠক, এই আমার রাম দাদা! প্রণাম কেহ কাহাকে সহজে করিতে চায় না। কিন্তু রামবাবুর চরণে মস্তক অবনত হয় কি না হয়, পাঠক অনুমান করুন। পতিত ও পতিতপাবনকে রামদাদাই চিনিয়াছিলেন। ঠাকুর আমার বাড়ীতে আসিলেন। অনেক ভক্ত সঙ্গে আসিল, রামদাদাও আনন্দে গদগদ হইয়া হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। বিবেকানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমায় "ধন্য তোমার বিশ্বাস" বলিয়া আমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। অবশ্যই তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছিল, পতিতপাবন আমায় কৃপা করিয়াছেন।

কি নিমিত্ত গালাগালি দিয়াছিলাম, জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। আমার মনে ধারণা ছিল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরকে সেবা করিতে পারিব না। কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহা হইলে মমতা-বশতঃ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিব। এই আমি মত্ততার বেগে ধরিয়া বসিলাম,—"তুমি আমার ছেলে হও।" ঠাকুর বলিলেন,—তা কেন,—তোর গুরু হব, তোর ইষ্ট হয়ে থাক্‌বো! তিনি ছেলে হইতে সম্মত হন না, এই আমি যা মুখে আসে, গালি পাড়ি।

রামদাদার কথা বলিতে, অনেক আমার কথাই বলিয়া ফেলিতেছি, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন! কতক অবস্থা বুঝাইব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা, এ আকাঙ্ক্ষা কতদূর পূর্ণ হইতেছে, তাহা পাঠক বুঝিবেন।

ঠাকুর সম্বন্ধে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী অনেকেরই রামদাদার সহিত কথোপকথন হইত, বিস্তর বাদানুবাদও হইয়া যাইত! বাদানুবাদে জয়ী হইব, এ প্রয়াস রামদাদার নাই। বাদী কিসে পরমহংসদেবের আশ্রিত হইবে, এই জন্যই রামদাদা ব্যাকুল! বাদানুবাদের পর, যদি কেহ না বুঝিয়া চলিয়া যাইত, রামবাবু আক্ষেপ করিতেন,—"আহা! ঠাকুর আমায় ও ব্যক্তিকে বুঝাইবার

শক্তি দিলেন না! আহা ও বড় অভাগা! এমন দয়াল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইল না।" রামদাদা উচ্চকণ্ঠে তর্ক করিতেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার মনোভাব বুঝা যাইত। ইনি বাদীকে দাম্ভিক বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতেন না। নিজ শক্তির ত্রুটি অনুভব করিতেন ও তাহার নিমিত্ত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাইতেন। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই হইয়াছে। যে দিন পরমহংসদেব বলেন যে, "আমি আর বলিতে পারি না, রাম প্রভৃতিকে শক্তি দে মা! উহারা যা বলিবার বলিয়া আমার নিকট আনিবে, আমি স্পর্শ করিয়া দিব।" রাম দাদার উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। আগ্রহ দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলিত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিত, কিন্তু রাম দাদার উৎসাহ দিন দিন দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"তত্ত্ব-মঞ্জরীর" পাঠক জানিয়াছেন, রামচন্দ্রের বৈষ্ণববংশে জন্ম, মৎস্য মাংসের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কোনও কুটুম্বের বাড়ীতে তাঁহাকে মাংস খাইতে বলায়, তিনি বিনা সম্বলে একাকী সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টে কলিকাতায় ফেরেন, এ ঘটনার উল্লেখ, তত্ত্ব-মঞ্জরীতে আছে। নাস্তিক অবস্থাতেও বংশ-সংস্কারবশতঃ মাংস তিনি স্পর্শ করিতেন না। মাছ মাংস তাঁহার বহুমূত্র রোগের পথ্য ছিল, চিকিৎসক ও আত্মীয়-বর্গের বহু অনুরোধে মৎস্য খাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাংস কখনও স্পর্শ করেন নাই। এত মাংসের প্রতি বিদ্বেষ। কিন্তু একদিন থিয়েটারে আমি মাংস প্রস্তুত করি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার উপস্থিত, রামদাদাও উপস্থিত। সেই মাংস ঠাকুরকে মানসিক ভোগ দিলাম। ভোগ দিয়া বলিলাম, "রামদাদা! এ তো প্রসাদ!" তিনি বলিলেন—"অবশ্য! যদি আমায় ধারণ করিতে বল, আমার মুখে দাও।" আমি বিপদগ্রস্ত হইলাম। অঙ্গুলী দ্বারা মাংস স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলী তাঁহার জিহ্বায় দিলাম, রামদাদা অবিচল রহিল। কেহ যদি সে সময় দেখিত, হয়তো মনে করিত, "ইনি যে মাংসে ঘৃণা বলেন, এ কথা মিথ্যা!" ঘৃণাভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। প্রসাদ! রামদাদার ঘৃণা নাই। কাঁকুড়গাছির উদ্যান হইতে অন্ন-প্রসাদ তিনি মুসলমান-চালিত গাড়ীতে লইয়া আসিতেন। প্রসাদ ব্যতীত কোনও অন্ন ধারণ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণ যাইলে, তাঁহাকে যা দিবার একেবারে দিতে বলিতেন ও নিবেদন করিয়া আহার করিতেন! আহারে বসিবার পর, আর কোনও দ্রব্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। জগন্নাথদেবের প্রসাদে লোকের

যেরূপ শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদেও তাঁহার অবিকল সেইরূপ ছিল। প্রসাদ জানিলে নীচ লোকেরও উচ্ছিষ্ট খাইতেন।

কাশীপুরের বাগানে যে দিন পরমহংসদেব কল্পতরু হন, সে দিন যাঁহারা রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি হইতে রামচন্দ্রের ছবি কখনও তিরোহিত হইবে না। আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ বলেন,—"পরমহংস-দেবের কৃপা আমি তো রাম বাবুর কৃপাগুণে লাভ করিয়াছি। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম; রাম বাবু হাত ধরিয়া টানিয়া আমায় প্রভুর সম্মুখে উপ-স্থিত করেন। এ কথার উল্লেখ করিতে করিতে অতুলকৃষ্ণ গদ গদ হন। রাম বাবুর কৃপাগুণ সে দিন অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন।

আমার সহিত রাম বাবুর অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে, কিন্তু কখনও তর্ক হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাম বাবুই আমার নিকট উপদেশ চাহিতেন, কিন্তু আমার যখন পত্নীবিয়োগ হয়, সহানুভূতিবশতঃ অনেক ভক্তই আমার নিকট আসেন; রামবাবুও আসেন। সহানুভূতির কোনও কথা নাই, কেবল বলিলেন,—"গিরিশ দাদা! এইবার তুমি মুক্ত, আর বন্ধন গ্রহণ করিও না।" আমি ভাবিলাম, বুঝি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাম আমার মনোভাব বুঝিয়া—"না না, আমি বিবাহের কথা বলিতেছি না, তাহার কল্পনামাত্র তোমার মনে উদয় হইবে না, তাহা আমি জানি; তোমার সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদের লইয়া একটা আড়ম্বর করিয়া সংসার করিও না। যাহারা অনন্যোপায়, তাহারা এইরূপে পত্নীবিয়োগ জনিত কষ্ট সম্বরণ করে। তোমার তো রামকৃষ্ণ রহিয়াছে, অন্য আড়-ম্বরে তোমার প্রয়োজন কি?"

মহোদয় মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায়, রামদাদা রাসায়নিক-শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসায়নিক-পরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আসিবার সময় একত্রে তাঁহার গাড়ীতে আসিতাম। সে সময় কোন কোন রাসায়নিক পণ্ডিতের অনুমানে অম্লজান (Hydrogen) হইতে সমস্ত বস্তু উদ্ভব হইয়াছে। আসিবার সময় রাম-দাদার সহিত একত্রে আসিতাম। সেই সময়ে প্রায়ই অম্লজান লইয়া কথা হইত।' কথার একই ধুয়া, এক হইতে বহু; জড়-বিজ্ঞানেও ইহা প্রমাণ— এই আন্দোলন করিতে করিতে পরমহংসদেবের কথা উত্থাপন হইত। মুগ্ধ হইয়া রামদাদা বলিতেন,—"আশ্চর্য্য প্রভুর মাহাত্ম্য! যে জড় বিজ্ঞানে আমাকে

নাস্তিক করিয়াছিল—প্রভুর কৃপায় দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়ায় দেখিতেছি—প্রতি পরমাণু প্রকাশ করিতেছে—অনন্ত—অনন্ত—সকলেই অনন্ত—আদি-অন্তহীন! অনন্ত চৈতন্য প্রতি পরমাণুতে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত। সভার রাসায়নিক আলোচনা—উচ্চ-জ্ঞান আলোচনায় পরিণত হইত এবং জ্ঞানাধার রামকৃষ্ণদেবের স্তুতিবাদের পর আমাদের সেদিনকার মিলন সমাপ্ত হইত।

সকল কথা বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইবে ও সর্ব্ব-সাধারণের ভাল না লাগিতে পারে। এক্ষণে আর একটী মাত্র ঘটনা বর্ণন করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের একটী বাটী ভাড়া করিয়া আছেন; কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল। ঠাকুর শ্রীমান্ কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।" কালীপদ অতি ভক্তির সহিত উদ্যোগ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। একদিকে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী, প্রভু অন্য আহার করিতে পারিতেন না, তাহার জন্য বার্লিও আছে। অপর দিকে স্তুপাকার ফুল, রক্ত কমল, রক্ত জবাই অধিক। পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট্ করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নয়, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে। রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—"যাও—যাও না!" রামদাদার কথায় আমার আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন,—"কি কি—এ সব আজ ক'রতে হয়।" আমি অমনি—"তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই" বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া "জয় মা" শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম। অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর—প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে। মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।

পরিশেষে একটী কথা—রামদাদার ভক্তের ভাল লাগিবে, এই জন্যই আমি উল্লেখ করিতেছি। রামদাদার দেহত্যাগের পর একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখি—তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, গা খোলা, ঠ্যাং ঠ্যাংএ সাদা ধুতী পরণে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রামদাদা। এখন কি কর?" রামদাদা উত্তর করিলেন,—যাহা করিতাম তাহাই করি, প্রভুর সেবা করি।" পরমহংস-দেব বলিতেন,—"দেবস্বপ্ন স্বপ্ন নয়—সত্য।" আমার ধারণা, দেবমূর্ত্তি রাম-দাদাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্য; তিনি পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত, তাহা সত্য; অনন্তকাল তিনি পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, সত্য।

নবম পরিচ্ছেদ।

উচ্ছ্বাস

যিনি আমাদিগের জীবনে পবিত্রতার সঞ্চার করিবার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া প্রাণ-সঞ্চারিণী তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে এ নশ্বর জীবনেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম, যিনি আমা-দিগের অকূল সাগরের কাণ্ডারী, যাঁহার মহান্ জীবনের আধিপত্য নিমিষের জন্যও অন্তর্হিত হইলে, আমরা সংসারহিল্লোলে পড়িয়া কোথায় নিমজ্জিত হইয়া যাইতাম, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সেই প্রাতর্বন্দনীয় মহাপুরুষ আজ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইলেন! জান কি, পাঠক! আজ কিসের জন্য হৃদয়তন্ত্রী দারুণ আঘাত পাইয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, কাহার অভাবে প্রাণ ব্যাকুলিত, নয়ন কাহার প্রশান্ত-মোহন মূর্ত্তি সন্দর্শনের জন্য চারিদিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া হতাশের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে? জান কি, যিনি "তত্ত্ব-মঞ্জরীর" জন্মদাতা, যাঁহার স্নেহ-যত্নে "তত্ত্ব-মঞ্জরী" প্রতিপালিতা ও যাঁহারই অনুকম্পায় বিবিধ পরমার্থ-তত্ত্বের মণিরত্নে বিভূষিতা হইয়া লোক-সমাজে পরিচিতা, সেই ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীরামচন্দ্র জড় দেহ বিসর্জ্জন দিয়া আপনার প্রাণারাধ্যের নিকটে চলিয়া গিয়াছেন। জান কি, তাঁহার বিরহে, কত দীন দরিদ্রের আশার অবলম্বন ঘুচিয়াছে, কত অনাথ-অনাথার আশ্রম-স্থল বিনষ্ট হইয়াছে, কত অজ্ঞানান্ধকারপীড়িত পথিকের জীবনের আলোকস্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে।

পরার্থে প্রীতির প্রস্রবণ, একাগ্রতা, তেজস্বিতা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ, নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি, বিশ্বাসের বিমল আধার, রামচন্দ্র বিগত ৪ঠা

মাঘ, মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় লোকলীলার রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নিপতিত করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের এক মহান্ মহীরুহ উৎপাটিত হইয়াছে, ধর্ম্মগগনের একটী জ্ঞানোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে, আর রামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলীর মধ্যবিন্দু অপসৃত হইয়াছে। জানি না, কি প্রকারে বিষম রোগ আসিয়া এ হেন পুণ্যপুঞ্জময় দেহে প্রবেশ লাভ করিল; জানি না, কোন্ প্রাণে কুটিল কাল এ হেন পবিত্র আধার স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইল না; জানি না, কোন্ অপরাধে তত্ত্ব-পিপাসু ভক্তগণ এ হেন সুশীতল নির্ঝরের জীবনদায়িনী বারিরাশি হইতে বঞ্চিত হইল!

হা বিধাতঃ! তুমি জগতে কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতেছ, কিন্তু এরূপ নিদারুণ পরিবর্ত্তন সাধিত না করিলেই কি তোমার কঠোর নিয়মের প্রতিপালন হইত না? জানি বটে, তুমি কোটীশ্বরের মণি-মণ্ডিত মস্তক ধূলায় ধূসরিত করিতে কুণ্ঠিত হও না, জানি বটে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরের বিনাশসাধনেও তোমার মন ব্যাকুল হয় না, কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, রামচন্দ্রের ন্যায় পরদুঃখকাতর মহাজনকে অকালে অন্তর্হিত করিয়া তোমার কি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়? যিনি আপনাকে ভগবানের দাস জ্ঞান করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, পরকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া, পরের সেবার জন্য, যিনি আপনার ধন, মান, শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিতে কাতর হন নাই, ভক্তি, যাঁহাতে আপনার পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া জগজ্জনকে বিমোহিত করিয়াছিল, পাপ-প্রবৃত্তি, যাঁহার নিকট আগমন করিতেও ভীতা হইত, সেই মহাত্মাকে, হে বিধি! বলিয়া দাও, তোমার কোন্ বিধি অনুসারে, জগতের চক্ষুর অন্তরালে লইয়া যাইলে? তোমায় কেহ নির্ম্মম বলিয়া তোমার গুণরাজির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, কেহ বা তোমাকে করুণাময় বলিয়া কীর্ত্তিত করিতেও চেষ্টা করে, কিন্তু হায়! তুমি আমাদের হৃদয়ে যে বিষ-দিগ্ধ শেল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহাতে তোমাকে আর বিশেষণে বিশেষিত করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার হৃদয়, তোমার প্রাণ, যে কি উপাদানে গঠিত, তাহা তুমিই বলিতে পার। তাহা না হইলে, শিষ্যবৃন্দের প্রাণের প্রার্থনা, গুরুদেবের অন্তরের ইচ্ছা, আত্মীয়-স্বজনের করুণ রোদন উপেক্ষা করিতে তোমার প্রাণ বিচলিত হইল না কেন? তুমি একবারও তাহাদের মুখের পানে চাহিলে না, তুমি একবারও তাহাদের দুঃখের দশার বিষয় চিন্তা করিয়া

দেখিলে না; তুমি স্বার্থপর, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াই পরিতুষ্ট হইলে। হৃদয়হীন! তুমি আপনিই যে দেহ ভগবানের শ্রীমন্দিরস্বরূপ করিয়া সংগঠিত করিয়াছিলে, তুমি আপনিই যথায় সংখ্যাতীত সদ্‌গুণ প্রস্ফুটিত করিয়া জনসমাজের নয়ন ও মন আকৃষ্ট করিয়াছিলে, তুমি আপনিই যাহাকে ভগবানের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলে, কি বলিয়া, কোন্ প্রাণে, তুমি আপনিই সেই দেহ হইতে পুনরায় জীবনী-শক্তি অপহৃত করিয়া লইয়া সমগ্র সেবকমণ্ডলীকে নয়ন-জলে ভাসাইলে?

রাম নাই! রাম নাই! রাম নাই!—চতুর্দ্দিকে হাহারব উঠিয়াছে। ভক্তমণ্ডলীর মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা-রেখার আবির্ভাব হইয়াছে। দরিদ্রের নয়নজল ঝরিতেছে। আর যাহারা মহাপুরুষের পদ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের তাপদগ্ধ জীবনে শান্তির মুখাবলোকন করিয়াছিল, যাহারা তাঁহার মুখ-বিগলিত উপদেশই একমাত্র অবলম্বন জানিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা অমূল্য নিধি হারাইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতেছে। দরিদ্রের জন্য, আর কাহার বল, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে? কে বল, ভগবানের জন্য, ভগবদ্ভক্তের জন্য গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও, আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না? কে বল আর আপনার শারীরিক সুস্থতার বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থরাশি ব্যয় করিয়া আপামরকে প্রসাদ বিতরণের জন্য ব্যগ্র হইবে? সে রাম নাই, সে রাজর্ষি জনকের ন্যায় ব্যবহারও আর দেখিতে পাইব না! সকলই ফুরাইয়াছে। হুতাশন পূর্ণাহুতি পাইয়াছে। পুণ্যাত্মার দেহের চিতা-ধূম উত্থিত হইয়া জগতে তাঁহার কীর্ত্তির ঘোষণা করিয়াছে। পবন ধীরে ধীরে আপনার কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া গৃহে গৃহে যাইয়া কহিয়াছে,—রাম নাই! রাম নাই! রাম নাই! আর যাঁহারা রামচন্দ্রের প্রিয়জন, তাঁহাদের মুখের বিষাদ-মলিন ভাবও যেন নীরবে সকলের নিকট প্রতিধ্বনি করিয়া কহিয়াছে,—রাম নাই! রাম নাই! রাম নাই!

হা পুণ্যভূমি যোগোদ্যান! যিনি তোমার শিরোদেশে যোগী-জন-বাঞ্ছিত পরম ধন স্থাপিত করিয়া তোমাকে শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি হইতে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি তোমার কক্ষে বক্ষে লক্ষ লক্ষ ভক্ত একত্রিত করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে তুমি সহস্র কণ্ঠের সমস্বরোচ্চারিত রামকৃষ্ণ-ধ্বনি শুনিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠিতে

তুমিও কি তাঁহাকে আপনার সঞ্চিত পুণ্যরাশির বলে পূর্ব্বের অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইলে না? যিনি নিশিদিন তোমার চিন্তায়ই নিযুক্ত থাকিতেন, তোমার উৎকর্ষ সাধন যাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল, যাঁহার প্রাণ, মন, অর্থ, সামর্থ, সমস্তই তুমিই অধিকার করিয়াছিলে, আজ তিনি কোথায় রহিলেন! আর কি রামচন্দ্র ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে লইয়া রামকৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার উপরে নৃত্য করিবেন ও তুমিও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া টলিতে থাকিবে? আর কি তুমি লীলাসম্বরণোৎসবে রামচন্দ্রের সহস্রধারে প্রবাহিত নয়ন-জলে অভিষিক্ত হইবে? আর কি সহস্র সহস্র ভক্ত জয় রামকৃষ্ণ শব্দোত্থিত করিয়া তোমায় পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে এবং রামচন্দ্র আপনার স্বাভাবিক দীন হীন ভাবে সকলকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিবেন? আর কি রামকৃষ্ণোৎসবে তেমনি করিয়া সহস্র সহস্র লোকে প্রীতি-বিভাসিত মুখে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বা না আছে, তাহা বোধ হয় তুমিই বুঝিয়া থাকিবে।

অথবা তোমায়ই বা এরূপ করিতেছি কেন? তুমিও স্বার্থপর। তোমার যখন স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে, তখন তুমি আমাদের প্রাণের বেদনা বুঝিবে কেন? তুমি যে অমূল্য রত্ন শিরে ধরিয়া জগতের ভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছিলে, জগতের লোকে যাহার জন্য কত সুদূর দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া তোমার ধূলায় দেহ মন পবিত্র করিত ও করিবে, তাহাতে তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না! যিনি সেই রত্নের পরিচর্য্যার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া রাখিবার সাধ হইল! তাহা না হইলে, যখন দারুণ অসুস্থতায় তিনি প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন তুমি আপনার পবিত্র রজোরাশি বায়ু-হিল্লোলে উত্থিত করিয়া অসুস্থ শরীরে সংস্পর্শিত করতঃ সুস্থতার সংবিধান করিলে না কেন? অন্যের যাহাই হউক, তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ভক্তেরা মহাপুরুষের দেহাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ সমাহিত করিয়াছে। যখন স্বপ্নেও যাহা কখন চিন্তা করি নাই, তাহাও আমাদের দুরদৃষ্টে সংঘটিত হইয়া যাইল, তখন তোমায় বলিয়াই বা আর কি করিব! যাহা বলিলাম, সে কেবল অন্তরের দারুণ যন্ত্রণায়।

লোকে বলিতেছে, রাম নাই! রাম নাই! রাম নাই! চতুর্দ্দিকে চাহিয়া

দেখিলে আর তাঁহার সেই ধীর-গম্ভীর আকৃতিও দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তখন কে যেন এই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের মধ্য হইতেও বলিয়া দেয়, রাম আছে! রাম আছে! রাম আছে! যখন সেই মহাপুরুষের বিচিত্র চরিত্রের গুণরাশি, সান্ধ্য গগনে তারকারাজির ন্যায়, এক একটী করিয়া চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, যখন তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিমোহিত হইয়া এক প্রকার আত্মহারা হইয়া যাই, তখন কি জানি কেন মনে হয়, রাম আছে! রাম আছে! রাম আছে! যখন তাঁহার ত্যাগশীলতা, তেজস্বিতা, একাগ্রতা, নৈষ্ঠিকী ভক্তি, সরলতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদের মানস-চক্ষের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে ক্ষণ-জন্মার পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করে, তখন প্রাণ না বলিয়া থাকিতে পারে না, রাম আছে! রাম আছে! রাম আছে! যখন শিক্ষা বিবিধ যুক্তি-তর্কের সহিত বুঝাইয়া দেয়, জগতে কিছুরই ধ্বংস নাই, তখন বলিতে বাধ্য হইয়া থাকি, রাম আছে! রাম আছে! রাম আছে! যখন বিশ্বাস অন্তরের অন্তর-তম প্রদেশে যাইয়া ধীরে ধীরে কহিতে থাকে, মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীভূত; তাঁহারই কার্য্যের জন্য, তাঁহারই সহিত এই ধরাধামে আসিয়া-ছিলেন, তখন প্রবল আশ্বাসে কহিয়া থাকি, রাম আছে! রাম আছে! রাম আছে!

যাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আজ হৃদয় স্ফীত ও কম্পিত হই-তেছে, যাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া লেখনিও ঘন ঘন কাঁপিতেছে, যাঁহার জন্য ভক্তের অশ্রুধারা ঝরিতেছে, তাঁহার উদ্দেশে আমরা প্রার্থনা করিয়া কহিতেছি, যেন তাঁহার জীবন ধ্যান করিতে করিতে আমাদিগের জীবনে, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার ভক্তি ও তাঁহার বিশ্বাসের কণিকারও সঞ্চার হইতে পারে।

বীরভক্ত রামচন্দ্র।

সৃজি চিত্ত-বিমোহন ধর্ম্মের কানন,
বসাইলে রামকৃষ্ণ-তরু সযতনে ;
প্রেম-মধু-পান আশে করিয়ে গুঞ্জন,
অলিকুল দলে দলে আসে নিশিদিনে।
নাশি কামিনীকাঞ্চন কণ্টক সকল,
রামকৃষ্ণ তরুতলে ভক্তচূড়ামণি,
সৃজিলে হে যতিগণ আবাস কেবল,
শুনিবারে "রামকৃষ্ণ" দিবস যামিনী।
তবে কেন লুকাইলে ওহে সুধীবর,
তোমা বিনা হীনশোভা হেরি সে কানন,
ভৃঙ্গকুল কণ্ঠে নাহি রামকৃষ্ণ স্বর,
নীরব সকলে এবে বিষাদে মগন !
ভক্তবীর রাখি কীর্ত্তি গেছ শান্তিধাম।
রামকৃষ্ণ পদে সুখ ভুঞ্জ অবিরাম॥

গীত।

(১)

গাও রে সুধামাখা—রামকৃষ্ণ নাম।
ঐ নামের গুণে তরে যাবি—অন্তে পাবি মোক্ষধাম॥
(রামকৃষ্ণ)

রামকৃষ্ণ নাম বলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ডাক রে মন, প্রাণ খুলে, বল রে নাম অবিরাম।
(জয় রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ বল রে মন অবিরাম)
শ্রীমুখের অভয়-বাণী, বলেছেন রাম গুণমণি,
সাধন-ভজন-হীনের, ঐ নামে হবে পূর্ণ কাম॥
(রামকৃষ্ণ নাম নিলে হবে সবে পূর্ণকাম)

গোলোকে (গোপনে) এ নাম ছিল, ধরাধামে কে আনিল
রামকৃষ্ণে চিনেছিল, প্রকাশিল গুরু রাম।
(পূর্ণ-ব্রহ্মে চিনেছিল, প্রকাশিল গুরু রাম)
দেবের দুর্লভ নাম, বিলাইল দয়াল রাম,
ঐ নামের সহিত বল, জয় গুরু জয় রাম ॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় গুরু জয় রাম

(২)

জয় রামচন্দ্র, ভক্তকুলকেন্দ্র, গুরুপদারবিন্দে মানস মগন।
সংসার-বিরাগী, প্রেমিক ত্যাগী, মহা অনুরাগী বীর মহাজন।
অপরূপ সেবা এ ভবে দেখালে, গুরু তরে কেঁদে অবনী ভাসালে,
রামকৃষ্ণ নাম যাচিয়ে বিলালে, দুর্ব্বলে দিলে হে নবীন জীবন।
জনক জীবনী শ্রবণে শুনেছি, সে ত্যাগকাহিনী মরমে ভেবেছি,
তোমার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি, হয়েছে সফল জনম জীবন ॥
সজ্ঞানে অজ্ঞানে গুরু মতি গতি, সম্পদে বিপদে গুরুপদে প্রীতি
গুরু যাগ যজ্ঞ যোগ মোক্ষ মুক্তি, অহরহ গুরু চরণ চিন্তন ॥
গুরু গুণ গান শ্রবণ কারণে, যোগোদ্যানে বাস লভিলে বিজনে,
গুরুগীতি রাস ডুবায়ে ভুবনে, ফুটালে মরমে প্রেমের প্রসূন ॥
সেবক প্রধান, সাধক পরম, দেহি মে ভকতি নিরমল প্রেম,
দেহি দেব নিষ্ঠা সেবা নিরুপম, ঘুচে যাবে যাহে এ ভববন্ধন

(৩)

আর কে বিলাবে, প্রাণ গলাবে রামকৃষ্ণ গুণগানে।
আপনি মাতিবে, জগত মাতাবে, বিকাইবে প্রাণপণে ॥
ছি ছি এ ছলনা সাজে না তোমারে, এত ভালবাসা ভুলি একেবারে,
কি দোষে হয়েছি দোষী ও চরণে, লুকাইলে অভিমানে ॥
আর কি হেরিব ও বদন-শশী, রামকৃষ্ণ নাম যাহে দিবানিশি,
সেই সুধারাশি শ্রবণে পরশি, জুড়াব তাপিত জীবনে ॥
কে গভীর রবে গগন ছাইবে, জাগাইবে জনে জনে,
হের রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ইষ্ট, বল রামকৃষ্ণ বদনে ॥

অপার করুণা অতুল ভুবনে, দীন দুঃখ হরণে ॥
রামকৃষ্ণ নাম, সুধা অবিরাম, বিমল শান্তি সেবনে ;—
কে শকতি ধরে শিক্ষা দিতে নরে, একা রামকৃষ্ণ সার কর তাঁরে,
সাধন-ভজন-বিহীন যে জন দেহ ভার শ্রীচরণে ॥
অনুপম ছবি অঙ্কিত অন্তরে, জলন্ত দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে,
সর্ব্বত্যাগী যোগী প্রত্যক্ষ সংসারে অযাচিত প্রেমদানে ॥
নবীন বয়সে নবীন লীলা নবীন মোহন সাজে,
কল্পতরু তায়, চৈতন্য বিলায়, হেরি তোমা সনে সে দিনে :—
পড়ে মনে ফিরে, দেখালে সবারে, পুরুষ প্রকৃতি পূর্ণ একাধারে,
লুকায়ে স্বরূপ যবে অপরূপ অভয়া অভয় দানে ॥
একা তুমি ভাই, তোমা সম নাই, বাঁধা রামকৃষ্ণ প্রেমের বাঁধনে,
তাই গুণমণি, উদয় আপনি, বিরাজিত যোগোদ্যানে ।
কি দিব তোমারে নাহি কিছু আর, নয়নের ধার ধর উপহার,
মতি গতি রামকৃষ্ণ পদে সার, রহে যেন চিরদিনে ॥
যে জ্বালা এ প্রাণে, জান প্রাণে প্রাণে, ব'ল ভাই ব'ল তাঁর সন্নিধানে,
সে ত গেছে চলে, তুমিও লুকালে কে চাহিবে মুখপানে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণপুস্তকাবলী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত। সেবক রামচন্দ্র প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

তত্ত্ব-প্রকাশিকা বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। রামচন্দ্র প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দুই টাকা।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী। প্রথম ভাগ এক টাকা। ৫০২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মহাত্মা রামচন্দ্রের দুইখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে।

রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য এক টাকা। ৫০৭ পৃষ্ঠা।

রামচন্দ্র-মাহাত্ম্য। মূল্য আট আনা।

লীলামৃত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা অবলম্বনে রামচন্দ্র লিখিত নাটক। মূল্য চারি আনা।